ট্যাংকি সাফ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
নিউ শশী প্রেস
অশোককুমার ঘোষ
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

রা-ম্বা

শ্রীদিব্যেন্দু পালিত
সুহৃদ্বরেষু

টাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ

ট্যাংকি সাফ করতে ষাট টাকা চেয়েছিল মাগন। চল্লিশ টাকায় রফা হয়েছে।

তো মাগন সেপটিক ট্যাংকির লোহার চাক্কি কোদাল মেরে খুলে বুরবকের মতো চেয়ে রইল। আই বাপ! হাউস ফুল!

হাউস ফুল না হলে ট্যাংকি সাফ করায় কোন আহাম্মক? কিন্তু মুশকিল হল, মাগনের আজ কোনো পার্টনার নেই। কাল হোলি গেছে, আজ রবিবার, মরদরা আজও সব চলাচল জমি ধরে নিয়ে পড়ে আছে। এ বাত ঠিক যে মুর্দার কানে কানে টাকার কথা বললে মুর্দাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। কিন্তু মাতালরা তো মুর্দা নয়। আর তাদের উঠিয়েও কোনো লাভ নেই। টাকার লোভে কেউ হয়তো গার্দা সাফ করতে এসে ট্যাংকির মধ্যে পড়ে গজব হয়ে যাবে।

প্রথম ট্যাংকিতে ময়লা, দু নম্বরে জল, তিন নম্বরেও জল। তিন নম্বরে পয়লা বালতি মেরে গান্ধা জল তুলে ড্রেনে ঝপাৎ করে ফেলে মাগন আপনমনে বলে—আই বাপ! হাউস ফুল! চালিশ টাকার তো সিরফ পাসীনা চলে যাবে। ফিন ভিটামিন উটামিন দিবে কৌন?

বারান্দা থেকে দত্তবাবু দেখছেন, হেঁকে বললেন—কী বলছিস রে ব্যাটা?

মাগন ঝপাং করে দুসরা বালতি মেরে মুখ তুলে এক গাল হেসে বলে—একটা বাংলা সাবুনের দাম দিবেন তো বড়বাবু? আর চায় পীনেকো পয়সা! আউর হোলির বখশিশ।

—ব্যাটা নাত-জামাই এলেন।

—এমন সাফা করে দিব না বড়বাবু। একদম বেডরুম।

—বকবক করিস না, হাত চালা। বেলা ভর তোর কাজ দেখতে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?

তিন নম্বর বালতি মেরে মাগন বলে—গিয়ে আরাম করুন না, কুছ দেখতে হবে না। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

দত্তবাবু স্টেটসম্যানটা খুলে পড়তে গিয়ে দেখলেন প্লাস পাওয়ারের চশমাটা চোখে নেই। চেঁচিয়ে বললেন,—মুনমুন, আমার পড়ার চশমাটা দিয়ে যা তো!

বলে কাগজের বড় হেডিংগুলো দেখতে লাগলেন। মন দিতে পারলেন না। চাল্লিশ টাকার কাজ হচ্ছে সামনে। দু ঘণ্টা বড় জোর তিন ঘণ্টা কাজ করে ব্যাটা

চল্লিশ চাক্কি ঝাঁক দিয়ে নিয়ে যাবে। রোজ একটা করে সেপটিক ট্যাংক যদি সাফ করে তবে মাসে কত রোজগার হয়?

ভাবতে গিয়ে ফোঁস করে একটা শ্বাস বেরিয়ে গেল। বারোশো টাকা!

দত্তবাবু খুব জোর হেঁকে বললেন—জোরসে চালা! জোরসে!

ট্যাংকির ভিতরে বক বক করছে জল। গহীন গান্ধা জল। ঝপাঝপ বালতি মারে মাগন আর বলে—চালাচ্ছে বাবা! বহুৎ গান্ধা বাবা, বহুৎ কাদো। চালিশ রুপিয়া সিরফ পসীনা মে গিয়া বাবা! ভিটামিন দিবে কোন?

দুই

মুনমুন সাজছে। সময় নেই।

ক'দিন আগেও চুলের গুছির গোড়ায় একটা গারডার বেঁধে বেরিয়ে পড়তে পারত। আজকাল আর তার জো নেই। যাদবপুরের জল এত খারাপ যে গত দু-বছরেই চুল উঠে উঠে এই ক'টা হয়ে গেছে। এখন মাথায় হাত বোলালেও চুল উঠে আসে, একবার চিরুনি চালিয়ে আনলে উঠে আসা চুলের গোছা দিয়ে দড়ি পাকানো যায়। এখন বব করেছে। তবু চুলের পিছনে খাটতে কম হয় না। শুধু চুল? গায়ের রং মেটে হয়ে গেল। যে দেখে সে-ই বলে—ইস! কী কালো হয়ে গেছিস! কতবার বলেছে বাবাকে এবার যাদবপুর ছাড়ো আর নয়, এর পর মাথায় টাক পড়বে, গায়ের রং হয়ে যাবে টেলিফোনের মতো। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে ভুল করে বলে উঠবে হ্যালো!

সময় নেই। শুধু শাড়িটা পরা বাকি।

—ব্লাউজের হুকগুলো লাগিয়ে দিবি লক্ষ্মীটি? বলতে বলতে গিয়ে সে হুস করে চুনুর সামনে পিছু হয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

চুনুর মুখ দেখে তার মন বোঝা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে সে এইটে অভ্যেস করেছে। মুখে একটা ভালমানুষী, আর বড় বড় চোখে ভাসানো দৃষ্টিতে সে চায় সব সময়ে। দিদিকে আসতে দেখেই চুনু একটা কাগজ লুকিয়ে ফেলল ফ্রকের ঘেরের নিচে।

—একক সংগীত তোর ভাল লাগে? বাব্বাঃ! আড়াই ঘণ্টা ধরে একই গলার গান শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় না?…ইস, হুকগুলো সব চেপটে গেছে। লন্ড্রীতে দিয়েছিলি বুঝি ব্লাউজটা? আছড়ে কেচেছে, হুকের মাথাগুলো সব বসে গেছে।

মুনমুন অধৈর্য হয়ে বলে—তাড়াতাড়ি কর না।

—করছি তো। হুকগুলো ঘরে ঢুকছে না যে। একটা সেফটিপিন দে, খুটে তুলি।

মনুমনুর নতুন প্রেমিক এসে দাঁড়িয়ে থাকবে রবীন্দ্রসদনে। মনুমনু খুব ভাল জানে এও বেশীদিন টিকবে না। শেষ পর্যন্ত কে যে পাবে তাকে তা কি এখনই বলা যায়? সতেরো বছর বয়সে কী করে বলবে, আসল লোকটা কে! এখনো কত জন আছে, কত রোমাঞ্চ আছে, কত রহস্য ও ঘটনা! তবু এখনকার মতো এই প্রেমিকটিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না।

সব সময়েই একটু দেরি করে যাওয়া ভাল। তা বলে বেশী দেরিও নয়। তাতে উৎকণ্ঠার বদলে বিরক্তি এসে যায়। মনুমনুর একটা হিসেব আছে। সে হিসেব মতো একটু বেশীই দেরিই হয়ে যাচ্ছে।

সে এক ঝটকায় সরে এসে বলে—ছাড় তো! তোর কম্ম নয়।

বলে সে নিজে নিজে ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছু ফিরে হাত পিছনে ঘুরিয়ে টপাটপ হুক লাগিয়ে ফেলে, বলে—কোথায় হুক চেপটে গেছে! আমার হাতে লাগল কী করে? মারবো থাপ্পড়—

চুনু ভাসা চোখে চেয়ে থাকে ভালমানুষের মতো যেন জানে না, হুক ঠিক ছিল। বলল—সুচিত্রার গান রোজ তো শুনছিস বাবা, রেডিওয় গ্রামোফোনে, মাইকে। আর কত? ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

—সুচিত্রা কখনো ডাল-ভাত হয়ে যায় না। আর হলেই কি? তুই রোজ ভাত খাস না? খারাপ লাগে? ভাত না পেলে তো কুরুক্ষেত্র করিস!

হঠাৎ কুঁকড়ে গিয়ে চুনু ফ্রক তুলে নাক চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে—এঃ মা! কী গন্ধ আসছে।

প্রচণ্ড সেণ্ট মেখেছে মনুমনু। প্রথমে সে পায়নি, এখন পেল গন্ধটা। একটা 'ওয়াক' তুলে দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় দরজাটা বন্ধ করে এসে 'উঃ উঃ' করে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—সেপটিক ট্যাংক খুলেছে। শীগগির জানলা বন্ধ কর।

তিন

—একটা দড়ি দিবেন বড়বাবু? আব পানী নীচা হয়ে গেল, বালতিতে দড়ি লাগাতে হবে।

—ওঃ, দড়ির কথা আগে বলবি তো! দাঁড়া দেখি আছে কি-না!

মাগন একগাল হেসে বলে—বারো আনা পয়সা দিন তো লিয়ে আসি।

—পয়সা দিলে পাওয়া যায় সে জানি। চালাকি করিস না। দেখছি দাঁড়া।

দত্তবাবু চেঁচালেন—কোথায় গেলে গো? এ ব্যাটা দড়ি চাইছে। আছে নাকি?

লীলাময়ী রান্নাঘরে নেই। খুঁজতে গিয়ে দত্তবাবু দেখেন, ফাঁকা রান্নাঘরে উনুনের ওপর ডাল ফুটছে। ডালের ফেনা উথলে উনুনের গায়ে পড়ে পড়ে ছ্যাঁক-ক্ ছ্যাঁক-ক্ শব্দ উঠছে।

দত্তবাবু ফিরে দাঁড়াতেই অন্যায়ের দৃশ্যটি দেখতে পেলেন।

দত্তবাবু তাঁর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' ডাকেন না বলে লীলাময়ীর বড় অভিমান। কিন্তু এ লোককে 'বাবা' ডাকা যায়? দত্তবাবু দেখতে পেলেন, ভিতরের দু ঘরের মাঝখানকার প্যাসেজে তাঁর রোগা খুনখুনে বুড়ো শ্বশুর-মশাই খুব গোপনে একটা গামছায় নাক ঝাড়ছেন।

শ্বশুরমশাইয়ের ভয়ে দত্তবাবু তাঁর পরিষ্কার গামছাখানা সব সময়ে লুকিয়ে রাখেন। কারণ শ্বশুরমশাইয়ের নিজের দুখানা গামছা থাকা সত্ত্বেও সে গামছায় তিনি নাক ঝাড়েন না বা পায়ের তলা মোছেন না। ও দুটো কাজের জন্য তিনি সব সময়েই অন্যের গামছা চুরি করেন। এখনো করছেন। আরো আছে। নিজের হাওয়াই চপ্পল থাকা সত্ত্বেও পায়খানায় যাওয়ার সময় শ্বশুর-মশাই লুকিয়ে জামাইয়ের হাওয়াই দুটো পায়ে দিয়ে যান।

কার না রাগ হয়? কিন্তু মুখোমুখি চোটপাট করে কিছু বলাও যায় না। কুটুম মানুষ।

দত্তবাবু প্যাসেজটার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললেন—গামছাটা আপনি পেলেন কোথায়?

'বাবা' ডাকেন না বলে যে শ্বশুরমশাই দত্তবাবুকে কম খাতির করেন তা নয়। বরং বেশীই করেন। বাবা ডাকেন না বলেই খাতির করেন। খাতিরের চেয়েও বেশী। ভয় পান।

বুড়ো মানুষটি ভয়ে হাঁ করে আছেন। আড়ষ্ট হাতে জামাইয়ের গামছা। সামলে নিয়ে বললেন—এইখানেই ছিল। সরিয়ে রাখছি। দেখো, তোমার গামছায় যেন কেউ হাত না দেয়। কাউকে হাত দিতে দেবে না। আমিও সবাইকে বারণ করি, অধীরের গামছায় তোমরা কেউ···

দত্তবাবু মুখটা কুঁচকে সরে এলেন। গামছাটা আজ আর একবার কাঁচিয়ে নিতে হবে। সরে আসতে আসতেই শুনতে পেলেন, 'হ্যাক' করে থুতু ফেলার শব্দ। পিছনে আর তাকালেন না। তাকালে আর সারাদিন জল খাওয়া হবে না। প্যাসেজেই জলের কুঁজো রাখা। শ্বশুরমশাই সারাদিন বাড়ির সর্বত্র থুতু ফেলছেন। সর্বত্র।

লীলাময়ী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরের ঘরের দরজার পাশে। একটু গোপনীয়তার ভঙ্গী মাখানো তাঁর শরীরে।

গোপনীয়তাটা বাহুল্যমাত্র। বাইরের ঘর থেকে যে আসছে তা শোনবার জন্য কান পাততে হয় না।

চার

যতটা সুভদ্রাকে ততটা আর কোনো মেয়েমানুষকে ঘেন্না করে না অধীপ। গুয়ের পোকাও কি ওর চেয়ে ভাল নয় ?

সুভদ্রা খাটে বসে আছে, সামনের দিকে জোড়া পা ছড়ানো, পিছনে হাতের ভর। মুখ সাদা, চোখ জ্বলছে। বলল—ন্যাকা—জানো না ?

—তুমি বলতে পারলে ? কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে বলতে পারে ওকথা ?

—নিজেরা কী ? লোকে শুনলে থুতু দিয়ে যাবে গায়ে। ভদ্রলোকের মেয়ে ! আমি ভদ্রলোকের মেয়ে না তো কী, তোমার মতো ইতরের বাচ্চা ?

মেয়েমানুষকে মারা ভাল নয় অধীপ জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে বুঝতে পারে, মার—মারের মতো এমন নিরাময় আর কিছুতেই নেই। মারই বোধ হয় সবচেয়ে শান্তি। এক পা এগিয়ে সে শরীরে রিম-ঝিম রাগের নাচ শেষ কয়েক মুহূর্তের জন্য সহ্য করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বলল—এই বজ্জাত মাগী ! মুখ ঘষে দেবো দেয়ালে !

দাও না ! দাও ! বলে চোখের পলকে উঠে আসে সুভদ্রা। একদম কাছে এসে চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—ছোটোলোকের ইতরের গর্ভে যার জন্ম তার কাছে আর কী আশা করব ? মারো !

অধীপ কথা বলতে পারে না। কাঁপে। স্ট্রোক হয়ে যাবে ! পাগল হয়ে যাবে ! ডিভোর্স…

সুভদ্রা ধকধক করতে করতে বলে—ন্যাকা ! জানো না, তোমার শরীরে কিসের রক্ত ! গুষ্টিসুদ্ধু বদমাইশ তোমরা, জানো না ? তোমার ঐ আদরের লেংড়ী বোন চুনু কেন আমাকে বিয়ের পরদিনই বলেছিল—এই বৌদি, তুমি কেন আমার দাদার সঙ্গে শোবে !

অধীপের এ কথাটা মাথায় ঢোকে কিন্তু সুভদ্রাই কথাটা বলতে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তার সমস্ত বিশ্বাসের ভূমি থেকে কে যেন তাকে তুলে ছুঁড়ে দেয় অন্য একটা হীন আর ক্লীব জগতে। সে কাঁপতে কাঁপতে কসাইয়ে গলায় বলে—কেন বলেছিল ?

সুভদ্রা সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে দিগবসনা আক্রোশে প্রায় নেচে উঠে বলে—সহ্য হবে কেন ? আদরের দাদার সঙ্গে অন্য কেউ শোয় তাতে বুক জ্বলে যাবে না ? ছিঃ ছিঃ ! তোমরা লোকসমাজে মুখ দেখাও কী করে ?

অধীপ হঠাৎ পাথরের মতো শান্ত হয়ে গেল ! খুন করার আগে যেমন মানুষ কখনো কখনো হয় ! একটু বাদেই সুভদ্রা তার হাতে খুন হবে, সুতরাং সে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পর ঠাণ্ডা গলাতেই বলতে পারল—তুমি নর্দমার পোকা।

—তা তো বলবেই। নিজেরাই কিনা। শ্বশুর আমাকে ভালবাসে বলে তোমার মা বলেনি, শ্বশুর বলেই কী, পুরুষ তো। যুবতী বউয়ের সঙ্গে অত মাখামাখি কিসের? তুমিও বলোনি, সুভ, তুমি বাবার সঙ্গে অত মেলামেশা কোর না। বলো নি?

বলেছে। ঠিক কথা, মায়ের কাছে শুনে তারও এক সময়ে বিশ্বাস হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সুভদ্রার অত স্নেহের সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অসংগতি আছে। বলেছে। কিন্তু মানুষের কি ভুল হয় না!

সুভদ্রা খোঁড়ো দ্রুতবেগে বলে—সন্দেহ করোনি নিজের বাবাকে? অমন মাতৃভক্তির কপালে ঝাঁটা। ডাইনী মুখে পোকা পড়ে মরবে, পচে-গলে মরবে।

ঠিক এই সময়ে দুর্গন্ধটা আসে। বহু দিনকার জমানো মল, ময়লা, জলের প্রচণ্ড গ্যাস ঘরটার বাতাস পলকে বিষিয়ে ওঠে। কিন্তু তারা দু-জন গন্ধটাকে টেরই পায় না। কিংবা পেয়েও উপেক্ষা করতে পারে। কিংবা হয়তো তারা ঠিক এই মুহূর্তে দুর্গন্ধটাকে উপভোগই করে।

আশ্চর্যের বিষয়, অধীপ হাসলো। অবশ্য এটা হাসি নয়। খুন করার আগে অভ্যস্ত খুনী কখনো সখনো এরকমই হাসে হয়তো।

তারপরেই সে চড়টা মারল। সুভদ্রা যে পাঁচ মাসের পোয়াতি তা মনে রইল না। লক্ষ্যও করল না যে তা দু-বছরের ছেলে দৃশ্যটা দেখছে।

পাঁচ

—চালা! জোরসে চালা জল্লাদ।

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। পাম্প তে নেহি যে ভটভট করে গাদ্দা খিঁচে লিবে!

দুনম্বর ট্যাংকিতে ঘপ করে বালতি মারে মাগন। হাউস ফুল।

দত্তবাবু চেঁচিয়ে বলেন—এই ব্যাটা ময়লা ফেলার গর্ত করবি না?

—হাঁ হাঁ, গোর্ত্তো হোবে গোর্ত্তো ভী হোবে। এক বোতল সরাবের দাম দিবেন তো বড়বাবু?

—নালীতে ময়লা ফেলবি তো পয়সা কাটবো। নালী আটকালে বাড়িওলা পাঁচকথা শোনাবে। খুব সাবধান।

—কোই চিন্তা নাই বড়বাবু। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

প্লাস পাওয়ারের চশমাটা পরেও স্টেটসম্যানের খবরগুলো দেখতে পান না দত্তবাবু। পুরোটাই আবছা, অস্পষ্ট, হিজিবিজি এবং অর্থহীন। তবু মুখের সামনে কাগজটা ধরে রাখেন। মুখোশের মতো।

মুনমুন কে চিঠি দিয়েছিল বাড়িওলার ছেলে মিলন। সেই চিঠি বাড়িওলা রসিকবাবুর হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন দত্তবাবু। সেই থেকে গণ্ডগোলের শুরু।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপরতলা থেকে পরিষ্কার শুনিয়ে দিলেন—এ শুধুই পারে না। নষ্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়ে মিলুও গোল্লায় যাচ্ছে। তুলে দাও।

দত্তবাবুর কিছু বলার দরকার হয়নি, লীলাময়ী নীচতলা থেকে গুটি উদ্ধার করলেন ওদের। কয়েকদিন দত্তবাবু বুকের প্যালপিটেশনে কষ্ট পেলেন খুব। তাঁর খুব ইচ্ছে করে, যে বাড়িওলার যুবক ছেলে নেই তার বাড়িতে উঠে যান। কিন্তু ইচ্ছে তো আর পক্ষিরাজ নয়!

এক বছর আগেকার সেই ঘটনা থেকেই অশান্তি চলছে। রান্না করতে করতে মাঝখানে কলের জল বন্ধ হয়ে যায়। আঁচাতে গিয়ে বেসিনে জল পাওয়া যায় না। লীলাময়ী নিচে থেকে দাপিয়ে চেঁচান। আর দত্তবাবুর ঝি বাসন মেজে কলতলায় ছাই ফেলে এলে ওপর থেকেও দাপানো আর চেঁচানোর শব্দ হয়।

শ্বশুরমশাই বকের মতো পা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছেন জল ঘাঁটতে। এ বাড়ির জলকষ্টের মূলে এই লোকটার অবদান বড় কম নেই। সারাদিন জল ঘাঁটছে লোকটা। হাঁপানি আছে। সর্দির ধাত আছে। সারা রাতের কাশি আছে। আর সেই সঙ্গে জল ঘাঁটাও আছে। জল ঘাঁটুক, তাতে দত্তবাবুর আপত্তি নেই। তিনি শুধু শ্বশুর-মশাইয়ের পায়ের চপ্পলটা লক্ষ্য করলেন দত্তবাবুর চপ্পলের স্ট্র্যাপ নীল রঙের শ্বশুরেরটা খয়েরী।

খয়েরী দেখে দত্তবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে আবার স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন, পরার দরকার ছিল। কারণ, লীলাময়ী আসছেন।

এসে একটা মুখ ছেঁড়া খাম দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই সেই চিঠি।

—কিসের চিঠি?

—বউমার বাক্স থেকে বোধ হয় চুনু নিয়েছিল।

—কেন?

—অন্যায় করেছে নিয়েছে। হয়তো লোভ সামলাতে পারেনি। এই নিয়েই অধীপের সঙ্গে ঐ ঝগড়া।

দত্তবাবু চিঠিটা হাতে নিয়ে বলেন—কবেকার চিঠি?

—বিয়ের আগে অধীপ বউমাকে যে-সব চিঠি লিখত তারই একটা। কী দরকার ছিল পুরোনো চিঠি জমিয়ে বুকে করে রাখবার? পুড়িয়ে ফেলা যেত না; ঘরে বয়সের ননদরা রয়েছে, কোলের ছেলেও বড় হচ্ছে···

—তুমি চিঠিটা পড়েছো?

খুব দৃঢ় গলায় নয়। ঝংকার দিয়ে লীলাময়ী বললেন—পড়ব কেন?

—পড়োনি?

—ওপর ওপর দেখেছি একটু। কী এমন কথা যার জন্য মাগীর আঁতে ঘা পড়ল।···উঃ, এই দুর্গন্ধের মধ্যে বসে আছো কী করে? তুমি মানুষ না কী?

দত্তবাবু বললেন—পড়ে ভাল করোনি।

—কেন? ভাল না করারই কী? তুমিও দেখো না। বলে লীলাময়ী খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দিয়ে বলে—পড়েই দেখ।

—বউমা কী করছে?

—কাঁদছে, ঘরে দরজা দিয়ে।

—তুমি যাও।

লীলাময়ী চলে গেলে দত্তবাবু চিঠিটা খোলেন।…অশ্লীল, খুবই অশ্লীল চিঠিটা।

মন থেকে আজ কেমন জোর পাচ্ছেন না। মনের জোরের জন্য খানিকটা নৈতিকতা দরকার। হ্যাঁ, মর‍্যালিটি তা কি তাঁর আছে?

লীলাময়ী দুর্গন্ধের কথা বলে গেলেন। কিন্তু তিনি দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন না।

ছয়

ডাক্তারকে খবর দেওয়া ছিল। সদর থেকে তাঁর হাঁক শোনা গেল এইমাত্র—কই বউমা কোথায়!

বাইরের বারান্দাটাই এখন বসার ঘর। অধীপের বিয়ের পরই বাইরের ঘরটার দরকার হল। তখন বারান্দাটা প্লাইউড দিয়ে ঘিরে সোফা সেট পাততে হল।

লীলাময়ী প্রমাদ গুনলেন। বউমাকে দেখতে এসেছে। সর্বনাশ! তার বাঁ গালে অধীপের পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে এখনো, তার ওপর নাগাড়ে কাঁদছে। বাইরের লোকের সামনে বেরোবে না কিছুতেই। যদিও বা বেরোয় তো ডাক্তার সবই লক্ষ্য করবে।

উঠে গিয়ে তিনি ঘোমটা টেনে বললেন—বসুন।

—বেশী বসবার উপায় নেই। চেম্বারে রুগী বসে আছে।

লীলাময়ী নিঃশব্দে গিয়ে দরজায় সামান্য শব্দ করে চাপা গলায় ডাকেন—বউমা! বউমা! ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজা খুলে দাও। ঠিকঠাক হয়ে নাও।

সুভদ্রা পাঁচ মাসের পোয়াতি। বড় ছেলে দুই পেরিয়েছে। সে হতে বড় কষ্ট গিয়েছিল। অধীপ তাই ঘন ঘন ডাক্তার ডেকে চেক আপ করায়। কিন্তু অধীপটা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। অবস্থাটা সামাল দেবেন কীভাবে তা ভাবতে ভাবতে লীলাময়ী গিয়ে চায়ের জল চাপান। চৌধুরী পারিবারিক ডাক্তার, তাঁর কাছে তেমন লজ্জা নেই। তবু তো লজ্জা! আজকালকার বউয়েরাও ভারি নির্লজ্জ। কথায় কথায় পরপুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের খুলে দেয়। ডাক্তাররা গোপন জায়গায় হাত দেয়, টিপ দিয়ে দেখে, অসভ্য সব প্রশ্ন করে। মাগো! লীলাময়ী মরে গেলেও পারবেন না। তাঁকে

কয়েকবার লেডী ডাক্তাররা দেখেছিল। তাতেই কী লজ্জা!

শচীলাল ডাক্তারের গন্ধ পেয়েছেন। থুতু ফেলার জন্য তাঁর একটা টিনের কৌটো আছে। সেইটে গিয়ে গোপনে বেসিনে ধুচ্ছিলেন। জল ঘাঁটছেন টের পেলে মেয়ে আজকাল বড় বকে।

ডাক্তারের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি কৌটো রেখে বাইরের বারান্দায় এসে বসেই বললেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু, গত দু বছর যাবৎ আমার পেটের কোনো গোলমাল নেই।

চৌধুরী হেসে বলেন—বাঃ, খুব ভাল।

—যা খাই সব হজম হয়। ইঁটের মতো শক্ত পায়খানা। আপনি আমাকে রোজ সকালে দুটো করে মুর্গীর ডিম খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে যান।

—সে আমি বুঝব খন। শ্বাসের কষ্টটা কেমন আছে?

—এটাই যা একটু কষ্ট দেয়, আর সব ভাল।

লীলাময়ী চা নিয়ে এসে বাবাকে দেখে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেন—তোমার আবার কী?

শচীলাল একগাল হেসে চৌধুরীকে বলেন—বুঝলেন ডাক্তারবাবু লীলা ভাবে আমি পেট খারাপের কথা লুকোই। কাল তাই প্যানের ওপর পায়খানা করে ডেকে দেখালাম। বল না লীলা ডাক্তারবাবুকে কেমন পায়খানা!

চৌধুরী বলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

লীলাময়ীর মুখ ফেটে পড়ছে রাগে. চাপা গলায় শচীলালকে বলেন—এখন ঘরে যাও তো!

—চা করলি?

—তুমি এখন খাবে না চা। স্নান করো গে। একেবারে ভাত দেবো।

—চালকুমড়ো পাতার পুর করবি না?

লীলাময়ীর হাত পা নিসপিস করে। গোপনে আবার এসে, বউমার ঘরের দরজা নাড়া দেন—শুনছো বউমা?

ঘরে ছেলেটা কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপ মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখেই শুরু করেছিল। তারপর থেকে ভ্যাবাচ্ছেই।

সুভদ্রার কান্না থেমেছে। গম্ভীর গলায় বলল—ডাক্তার বিদেয় করে দিন গে। আমি দেখাবো না। আর বিরক্ত করবেন না আমাকে।

ভারী অসহায় বোধ করেন লীলাময়ী। কী করবেন? চৌধুরী এসেছেই যখন, রুগী দেখুক আর না দেখুক, ভিজিটের টাকাটা দিতেই হয়। কিন্তু অধীপ ভিজিটের টাকা রেখে যায় নি।

—ইসি ট্যাংকিমে আর কুছু নাই বড়বাবু।

—নেই মানে? ইয়ার্কি পেয়েছিস? ডাণ্ডা মার, মার ডাণ্ডা। দেখি কতখানি আছে।

মাগন বলে—হাঁ হাঁ দেখে লিন।

ডাণ্ডা মারতেই সেটা ভচাক করে দু-হাত পুরু ময়লায় ডেবে গেল।

—ঐ তো। এখনো অর্ধেক রয়ে গেছে। চালাকি করার আর জায়গা পাস না? চল্লিশ টাকা কি এমনি এমনি দেবো?

ডাণ্ডাটা তুলে ময়লার দাগ দেখিয়ে মাগন বলে—বাস এইটুকু তো সব ট্যাংকিতে থাকে। ট্যাংকি কি কখনো পুরা সাফা হয় বড়বাবু? কুছু তো থেকেই যায়। ই তো স্রিফ বালু আছে।

—বকবক না করে কাজ কর তো।

—হাঁ হাঁ কাম তো করছে বড়বাবু।

দু নম্বর ট্যাংকিতে জলের নিচে ময়লা এখনো থকথক করছে। শক্ত মাল। বালতি মারলে ডোবে না। পা গর্তে ঢুকিয়ে চেপে বালতি ডোবায় মাগন। বলে —বহোত পরেসান বাবা। একটা পুরানা জামা দিবেন তো বড়বাবু? ট্যাংকি বেডরুম বানিয়ে দিব।

লীলাময়ী আসছেন টের পেয়েই দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশটা পরে নিলেন।

কিন্তু লীলাময়ী এলেনই। নাকে চাপা আঁচলের ফাঁক দিয়ে বললেন— চৌধুরী এসেছে। বউমা ডাক্তার দেখাবে না বলছে। কিন্তু ভিজিট তো দিতে হয়। অধীপ টাকা রেখে যায়নি।

বিরক্ত দত্তবাবু বলেন—আমার ব্যাগ থেকে নিয়ে দিয়ে দাও গে। অধীপ এলে চেয়ে রেখো।

—চাইবো, কিন্তু সে দেবে কেন? তার বউকে তো আর দেখেনি।

—সেই তো ডেকেছে, আমরা তো কল দিই নি। রেসপনসিবিলিটি তার।

লীলাময়ী নাকটা ছেড়ে একটু দম নিতে গিয়েই দুর্গন্ধে শিউরে উঠে 'হ্যাক' শব্দ করে আবার নাকে চাপা দিয়ে বলেন—বলছি কী, ভিজিট যখন দিচ্ছিই তখন আর মাগনা ছাড়ি কেন। প্রেসারটা দেখিয়ে নিই। বাবার বুকটাও পরীক্ষা করুক। তুমিও তো পরশুদিন মাথা ঘোরার কথা বলছিলে, দেখিয়ে নেবে নাকি?

ঠিক এই সময়ে ওপর থেকে রসিকবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে বলেন—এই জমাদার! নর্দমায় ময়লা ফেলছো যে বড়? নালী আটকে যাচ্ছে না?

মাগন মুখ তুলে বলে—নালী টেনে দিব মা। কাম পুরা করে পয়সা লিব।

—কেন, গর্ত করতে কী হয়? বলা হয়নি তোমাকে গর্ত খুঁড়তে? টাকা মাগনা আসে?

—হাঁ হাঁ, গাড্ডা ভী হোবে।

রসিকবাবুর স্ত্রী বেশ চেঁচিয়ে বলতে থাকেন—ছ-মাস আগে ট্যাংক পরিষ্কার করানো হয়েছে, এর মধ্যেই যে কী করে ভরে যায় তা তো বুঝি না!

কথাটা গায়ে না মাখলেও হয়। কিন্তু লীলাময়ী মাখলেন।

—শুনলে?

দত্তবাবু স্টেটসম্যানের মুখোশ পরে ফেলেন। লীলাময়ী মুখটা সিলিং-এর দিকে তুলে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়েন—ময়লা কি শুধু আমাদের একার? ওপরতলায় বুঝি সব দেবতারা থাকেন, তাঁরা কেউ হাগেন মোতেন না? আর জমাদারের টাকার অর্ধেক তো আমাদেরও দিতে হবে। মাগনা কাজ হচ্ছে নাকি?

রসিকবাবুর স্ত্রী নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব কথা বোঝা যায় না। শুধু স্পষ্ট করে শুনিয়ে বললেন—ঐ তো ছেলে ধরতে বিবি বেরিয়ে গেলেন। আর দোষ হল কি-না আমার মিলনের। গুষ্টিসুদ্ধু তেড়ে এসেছিলেন ঝগড়া করতে। বলি, মেয়ে কোথায় যায়, কার সঙ্গে কি রকম ঢলাঢলি তার খবর রাখছে কে? সে বেলা তো চোখে তুলসীপাতা এঁটে থাকা হয়।

লীলাময়ী এখন আর দুর্গন্ধটা পাচ্ছেন না। নাকের কাপড় কখন খসে গেছে। বড় বড় চোখে লীলাময়ী স্বামীর দিকে তাকান। মুখে কথা নেই।

দত্তবাবু এমন মুখের ভাবখানা করেন, যেন তাঁর মেয়ে বা তাঁর পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছে না। এ যেন অন্য কারো কথা। প্রচণ্ড জিদবশত তিনি কাগজে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ দাঙ্গার খবর পড়তে থাকেন। এক বর্ণও বুঝতে পারেন না।

একবার ভাবলেন ডাক্তার চৌধুরীকে প্রেশারটা দেখিয়ে নেবেন।

আট

চুনুর একটা পা শুকনো কাঠি। একটা হাতও কমজোরী। বড় কষ্ট তার হাঁটাচলার। যে তাকে দেখে সে-ই দুঃখ পায়।

আর অন্যের এই দুঃখবোধটা খুব ভাল কাজে লাগাতে শিখে গেছে চুনু।

জানলার কাছে একটা সাইকেল থেমে আছে। সাইকেলের ওপর শিবাজী।

—ডলিকে আমি নিজের চোখে দেখেছি পাম্প ছাড়তে। চুনু খুব ভাল মানুষের মতো বলে।

—কিন্তু আমার পিছনের চাকাটায় তো লিক বেরোলো।

—লিক? তবে ঠিক সেফটিপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। তুমি তখন মান্তুদের

বাড়িতে ক্যারাম খেলছো। খেলছিলে না ?

—ক্যারাম ?

—মিথ্যে কথা বোলো না।

শিবাজী হেসে বলল– খেলছিলাম। তুমি ডলিকে বলেছো ?

—না, মাইরি, কালীর দিব্যি।

—তবে বলল কে ? ডলি জানল কী করে ?

—বলবো—সত্যি কথা একটা ? কিছু মনে করবে না তো ?

—বলো না।

—মান্তু। ঠিক মান্তুই বলেছে। মান্তু আজকাল ইউনিভারসিটির ঝিলে গিয়ে কার সঙ্গে বসে থাকে জানো ? তপন।

—সেই বদমাশটা ? গেলবারও আমাদের হাতে মার খেয়েছিল !……এই ! তোমার বাবা !

বলেই শিবাজী জানলার নিচে ডুব দেয়। পরক্ষণেই তার সাইকেলের ঘণ্টি দূরের রাস্তায় দমকলের ঘণ্টার মতো ঘন ঘন রি রি রিং রি রি রিং বাজতে থাকে।

চুনু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তার মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। বউদির চিঠি চুরির জন্য মা তাকে বকেনি। আসলে বকতে সাহস পায়নি। বাবাও পাবে না।

দত্তবাবুও জানেন চুনুকে শাসন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কাউকেই শাসন করার ক্ষমতা নেই। এ বাড়ির কেউই তাঁর কথা শোনে না।

—এ চিঠিটা চুরি করেছিস ?

ঠাণ্ডা গলায় চুনু বলে—বেশ করেছি। একশ বার করব।

এই মেয়ের জন্যই দত্তবাবু আর লীলাময়ী গত পাঁচ বছর এক বিছানায় শুতে পারেন নি। চুনু তখন থেকেই তার মাকে প্রায়ই বলত—লজ্জা করে না তোমরা বুড়ো বয়সে একসঙ্গে শোও ? কেন শোবে ?

কী লজ্জা ! সেই লজ্জায় লীলাময়ী দত্তবাবুকে বলেছিলেন—মেয়ে যখন চায় না তখন থাক না হয়।

দত্তবাবু গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কিছু বলেননি। লীলাময়ীই আবার নিজে থেকে বলেন—ও তো জানে ওর সাধ আহ্লাদ মিটবে না। তাই বোধ হয় হিংসে। হবে। কিন্তু সেই আক্রোশটা দত্তবাবুর যায়নি এখনো। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—কী বললি ?

তাঁর চেহারাটা কেমন দেখাল কে জানে ! হয়তো খুবই ভয়ংকর। দত্তবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

ভয় পায় না, তবে এখন পেল। পিছনে হাত নিয়ে জানলার গ্রীল চেপে ধরে তবু ত্যাড়া ঘাড়ে চুনু বললে—গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি ! ইঃ তেজ

দেখাতে এলেন ! মুরোদ জানা আছে। কই, বউদিকে তো চোখ রাঙাতে পারো না, যখন মাকে যা তা বলে মুখের ওপর ! তোমার উইকনেস জানি। বেশী তেজ দেখাতে এলে সবাইকে চেঁচিয়ে বলব।

দত্তবাবু অবশ হয়ে যান। ঘেমে যান। মুহূর্তের মধ্যে। মারবেন বলে হাত তুলেও ছিলেন। সেই হাত সজোরে নেমে ঝুলে পড়ল ফাঁসীর মড়ার মতো।

আস্তে আস্তে ফিরে এসে স্টেটসম্যানের মুখোশ পরলেন।

এই সেদিন অধীপ যখন বিয়ে করবে বলে মাকে গিয়ে ধরেছিল সেদিন লীলা-ময়ীর কাছে সব শুনে কী রাগটাই না করেছিলেন তিনি। ছেলে তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ঢুকেই বিয়ে। পার্মানেন্ট হ। মাইনে একটু ভদ্রগোছের হোক। নইলে তো হ্যাপা সামলাতে হবে বাপকেই।

কিন্তু দত্তবাবুর ইচ্ছেয় কিছু তো হয় না এ বাড়িতে। যার যা ইচ্ছে তাই করে। অধীপেরও বিয়ে হল।

নতুন বউকে দেখে ভারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন দত্তবাবু। বহুকাল এমন মিষ্টি মুখ দেখেননি। বউভাতের পরদিনই মাথাখানা বুকে টেনে বলেছিলেন—এখন তুমিই সংসারের কর্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা বলা ঠিক হয়নি। সেই থেকে সংসারের অশান্তির সূত্রপাত।

মনের মধ্যে পাপ আছে কি ?

কে জানে বাবা ! কে জানে ! তবে পাপের চেয়েও লজ্জা অনেক বেশী।

শ্বশুরমশাই কী একটা পিছনে লুকিয়ে নিয়ে চুপিসাড়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছেন।

উঁকি মারলেন দত্তবাবু। দেখলেন, তাঁর নীল স্ট্র্যাপের হাওয়াই চপ্পলজোড়া

নয়

লীলাময়ী দুটো প্রেশারের বড়ি একসঙ্গে খেলেন। বেড়েছে।

একটা ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পেয়েছিলেন যেন একটু আগে। মনের ভুলও হতে পারে। তবে কান খাড়া রাখছেন।

শচীলাল স্নান সেরে এসে নিজেই আসন পেতে জল থালা আর নুন নিয়ে বসে পড়েছেন ভিতরের বারান্দায়। ডাকছেন—লীলা, দিবি নাকি ?

ঠিক এই মুহূর্তে লীলাময়ীর রাগ হল না। কদিন আগেও শচীলাল জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া খেতেন না। ভদ্রতাবোধ বরাবরই প্রবল। ইদানীং এই সব হচ্ছে। লীলাময়ী বললেন—বসে থাকো একটু। যাচ্ছি।

শচীলাল বসে থাকেন। দুর্গন্ধ পাচ্ছেন ঠিকই। গা করছেন না। বড়

মেয়ে হিরণ্ময়ী বলেছে, নিয়ে যাবে শীগগিরই। হিরণ্ময়ীর অবস্থা ভাল দুবেলা মাছ হয়, মাঝে মাঝেই পোলোয়া। কতকাল পোলোয়া খান না শচীলাল!

লীলাময়ী টের পান, সুভদ্রা দরজা খুলল। প্যাসেজ দিয়ে নাতিটার পায়ের আওয়াজ ধেয়ে আসছে, কাঁচগলার ডাক এল— ঠানু। ও ঠানু আমরা যাচ্ছি।

সুভদ্রা গর্জায়—এই! খবরদার যাবি না। গলা টিপে মেরে ফেলব তাহলে।

ছেলেটা ফিরে যায়। একটু কাঁদে কি? লীলাময়ী উঁকি মেরে দেখেন, প্যাসেজ দিয়ে বাথরুমের দিকে গেল সুভদ্রা। ছেলের নড়া শক্ত হাতে ধরা। সাজগোজ সব হয়ে গেছে। যাওয়ার জায়গা বলতে বাপের বাড়ি। তা যাক। বাড়িটা জুড়োবে।

—লীলা দিব? শচীলাল ডাকেন।

এবার রাগেন লীলাময়ী। চাপা গর্জনে বলে—বড়দিরও আক্কেল দেখছি। কবে থেকে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সব যে যার স্বার্থ দেখছে। এই বুড়োর হ্যাপা যত আমাকেই সামলাতে হবে বরাবর? শরীর আমার বারো মাস খারাপ থাকে। স্বার্থপর, সব স্বার্থপর!

দ্রুত পায়ে বারান্দায় গিয়ে তিনি শচীলালের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—কেন তোমার গুণধর ছেলে বাবাকে নিয়ে কদিন রাখতে পারে না? নাকি তাতে বউয়ের মাথা ধরার ব্যামো বাড়বে!

দশ

উঠোনে কোমর পর্যন্ত গর্ত খুড়ে ফেলেছে মাগন। ঘামে জবজব করছে। পায়ে কাঁচের টুকরো ফুটছে একটা। সেই নখে টেনে তুলে ফেলল। কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে রক্ত লেপটে দিল।

—কী রে দিন কাবার করবি নাকি?

—হচ্ছে বাবা, হচ্ছে। মাগন গর্ত থেকে উঠে এসে এক নম্বর ট্যাংকিতে বালতি নামিয়ে বলে—আভি দেখে লিন, সব সাফা।

রসিকবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে এবং দত্তবাবু নিচ থেকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন —অনেক ময়লা রয়েছে এখনো!

মাগন হাসে। বলে—ময়লা তো আছে মালিক, কিন্তু উ তো সব শুখা মাল আছে। মালটা শক্তো হয়ে গেছে বড়বাবু, উঠবে নাহি।

—নাম ব্যাটা ট্যাংকে, নেমে কোদাল মেরে চেঁছে তোল। টাকা কি গাছে ফলে?

—হাঁ হাঁ বাত তো ঠিক আছে বড়বাবু। লেকিন পাঁচ রুপেয়া বকশিশ দিয়ে দিবেন। চালিশ টাকার তো পসীনা চলিয়ে যাচ্ছে। ভিটামিন দিবে কোন?

মাগন ট্যাংকে নামে। গার্দা সব পাথরের মতো বসে গেছে। থকথক করছে পোকা, জল। বহোত গান্ধা।

কোদালে ময়লা চাঁচতে চাঁচতে মাগন আপনমনে বলে—কাম পূরা করে পয়সা লিব মালিক। বহোত গার্দা বাবা, বহোত গান্ধা। সব গার্দা সাফ থোড়াই হোবে বাবা। গার্দা কুছ জরূর থেকে যাবে মালিক। সব গার্দা কখনো সাফা হয় না।

লুলু

লুলুই হচ্ছে সব কিছুর মূলে।

লুলু আসলে কে বা তার গুরুত্বই বা কী তা আমার কাছে অস্পষ্ট। তবে যতবারই দেশে কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে তখনই আমাকে লুলুর কাছে আসতে হয়, তার সাক্ষাৎকার নিতে। এ যাবৎ তার কত যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তবু লুলু আমাকে আদপেই মনে রাখেনি। দেখা হলে সম্পূর্ণ নতুন করে পরিচয় দিতে হয় এবং পুরোনো পরিচয়ের কোনো স্মৃতির ঝলকানিও লুলুর ভাবসাবে কখনো ফুটে ওঠে না। এটাই যাকে বলে আফসোস কি বাত।

১৯৪৭ সালের ষোলোই আগস্ট আমি লুলুর সাক্ষাৎকার নিতে আসি, মনে আছে। তখন লুলুর চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল না, তবে সে তখনো এখনকার মতোই ব্যস্ত মানুষ ছিল। দেখা করার জন্য আমাকে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়। ঘরে ঢুকে কিন্তু লুলুকে একটুও ব্যস্ত দেখিনি। টেবিলের ওপর পা তুলে সে বসে ছিল। চেয়ারটা পিছন দিকে হেলে দুটো পায়ার ওপর বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে কোনোক্রমে। লুলু মৃদু হেসে বলল—বাঁ কুইক।

—এই স্বাধীনতা, এই চূড়ান্ত জয়, এই দেশ বিভাগ এবং এই···এই···আবেগে আমার গলা বসে গেল।

লুলু মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই স্বাধীনতা, এই দেশ বিভাগ আর যা কিছু সবই খুব চমৎকার। অতি চমৎকার। এই জয়···তবে আমার একটা ভয় হচ্ছে যে, যে সব ইংরেজ এদেশে মারা গেছে তাদের ভূতগুলো চলে যাচ্ছে না। সেগুলোকে যদি না তাড়ানো যায় তবে পাকে প্রকারে ইংরেজও থাকছে। এবং ইংরেজীয়ানাও। এখন আমাদের উচিত হবে ভারতের অতীতের ভূতদের ইংরেজ ভূতের বিরুদ্ধে লাগানো।

লুলু যে সামান্য মাতাল অবস্থায় ছিল তা তখন আমি টের পাই।

গান্ধী-হত্যার পর আমি লুলুর কাছে গিয়ে আবার ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর চেম্বারে ঢুকে দেখি লুলু অবিকল সেইভাবেই বসে আছে।

বলি—এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই হত্যা···

লুলু মাথা নেড়ে বলল—জঘন্য। আসলে একজনকে খুন করার মধ্যে কী যে আছে আমার মাথায় আসে না। লাভ কি? আমার তো ভাবতেই জ্বর আসে। খুনের পর ধরা পড়তে হবে, দিনের পর দিন স্নায়ু-ছেঁড়া মামলা চলবে। তারপর ফাঁসি···ওঃ। তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আছে। ধরুন কাউকে মারার ইচ্ছে হলে আমি তার একটা মূর্তি তৈরী করে সেটার ওপর গুলি চালালাম, ইচ্ছে মতো তারপর লোকটাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে, অমুক দিন অমুক সময়ে তোমাকে আমি মেরে ফেলেছি। বাস, লোকটাও তা জানার পর একদম মৃতের মতো হয়ে যাবে। অর্থাৎ সব কাজ কর্ম অ্যাকটিভিটি বন্ধ করে দেবে। হত্যাটা হবে প্রতীকী এবং তাতে হিংস্রতাও থাকবে না।

চীন-যুদ্ধের সময় ফের পত্রিকার তরফ থেকে লুলুর কাছে যাই।

—এই যুদ্ধ সম্পর্কে···

লুলু অবিকল একইভাবে চেয়ারে দোল খেতে খেতে বলে—হোপলেস। যুদ্ধ টুদ্ধের কোনো মানেই হয় না। বিশেষ করে চীনেদের সঙ্গে। আমার মনে হয়, এসব ডিসপিউট মেটানোর জন্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সাগ্রহে বলি—কিরকম?

—ধরুন চীনের সঙ্গে ভারতের একটা হকি ম্যাচের ব্যবস্থা হল। যদি ভারত জেতে তাহলে তার কথাই থাকবে। হকিতে আপত্তি থাকলে চীন পিংপংয়েও ভারতকে চ্যালেনজ করতে পারে। যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে, স্পোর্টসের যুদ্ধটা সেরে নেওয়া ভাল। সিরিয়াসলি মারপিটটা নিছক ছেলেমানুষী। আমি জানি চীন বলছে যে, তিব্বত তাদের। আমার প্রথম বিয়ের আগে আমার বউও বলত সে নাকি আমার, একান্তই আমার। তারপর আরো চারবার বিয়ে করতে হয়েছে আমাকে এবং এখন আবার আমি দারাহীন, কিন্তু প্রথম বউয়ের মতো সব বউই আমাকে ঐ একই কথা বলেছে, এবং ঐ একই কথা হয়তো এখনো তারা তাদের নতুন নতুন প্রেমিক বা স্বামীর কাছে বলছে। এ সবের কোনো মানে নেই। দুনিয়াতে কেউ বা কিছু কারো বা কিছুর নয়।

সেদিনই আমি লুলুকে বলি—আপনার চেম্বারটা এয়ারকণ্ডিশনড করান না কেন? আর ঐ বিপজ্জনক চেয়ারের বদলে আপনি তো অনায়াসে একটা রিভলভিং চেয়ারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

এরপরও পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম, কংগ্রেস ভাগ, নকশাল আন্দোলন, যুক্তফ্রনট ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে লুলুর সাক্ষাৎকার নিতে হয়। কিন্তু সেগুলোর কথা থাক। ইমারজেন্সীর পর যখন আমি লুলুর কাছে যাই তার বেশ কিছু দিন আগে তার চেম্বার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং সে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। একটু মাতাল।

বললাম—ইমারজেন্সী সম্পর্কে কিছু বলবেন?

লুলু টেবিলে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে—আলবাৎ।

—কী ?

—দেয়ার ইজ অ্যান ইমারজেন্সী। খুবই জরুরী ব্যাপার। খুবই আর্জেণ্ট। অনেকক্ষণ ধরেই এটা আমি ফিল করছি। চলুন যাওয়া যাক।

—কোথায় ?

— জরুরী কাজে। খুবই জরুরী।

এই বলে লুলু উঠে পড়ে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে আনে রাস্তায়, গাড়িতে ওঠায় এবং একটা মদের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলে —এ ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

—কিন্তু আমি জরুরী অবস্থা জারি প্রসঙ্গে……

লুলু আধো চোখে আমাকে দেখল। খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। দু পেগ করে হুইস্কির হুকুম দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল—আপনি নতুন জার্নালিসম করছেন, তাই না ?

—না। আমি দীর্ঘকাল ধরে…ইন ফ্যাক্ট আমি আপনার ইণ্টারভিউই তো বহুবার…

লুলু মাথা চেপে ধরে একটা কাতর শব্দ করল। তারপর বলল—তাহলে আপনি একটি গর্দভ রিপোর্টার।

—কেন ? আমি ফুঁসে উঠে বলি। পরমুহূর্তেই আমার মনে পড়ে যায় যে, লুলু অত্যন্ত ইমপর্ট্যাণ্ট লোক। দেশের অন্যতম প্রধান নায়ক। সব কিছুর মূলেই লুলু। তাই আমি আবার বিনীত হয়ে বলি—হতেও পারে।

লুলু বলে—অত্যন্ত জরুরী।

—কী ?

—এই জরুরী অবস্থা। অন্তত সাতাশ বছর আগে এটা জারি করা উচিত ছিল।

কেন ?

লুলু তার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—ফর ওয়ান থিং। গত সপ্তাহে আমার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাওয়া বাতিল করতে হয়। আমি ট্রেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করার জন্য রেল অফিসে ফোন করি। ফোনের রিং হতেই ওপাশে কে যেন রিসিভার তুলে বলল নমস্কার। আমি রং নাম্বার ভেবে ফোন ছেড়ে দিই। কিন্তু তারপর আরো তিন তিন বার সেই আশ্চর্য ঘটনা। রেল অফিস টেলিফোনের জবাব দিচ্ছে, এবং জবাব দেওয়ার আগে নমস্কারও জানাচ্ছে। জাস্ট থিংক অফ ইট। গত সাতাশ বছর ধরে আমি রেল অফিসে ফোন করে আসছি, কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি।

আমি খুব মন দিয়ে নোটবইতে কথাগুলি লিখছিলাম। লুলু নোটবইটা সরিয়ে নিয়ে বলল—ওহে ইডিয়ট রিপোর্টার, ইমারজেন্সীর মর্ম কবে বুঝবে? তোমার হুইস্কির গ্লাসে এক্ষুনি একটা দারুণ ইমারজেন্সী দেখা যাচ্ছে। বরফ

গলে গরম হয়ে যাচ্ছে হুইস্কি। আগে ওটা খাও, তারপর লিখবে।

লুলু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তার অবাধ্যতা চলে না। হুইস্কি খেতে খেতে আমি বলি—কিন্তু রেল অফিস থেকে টেলিফোনে নমস্কার জানানোটাই তো বড় কথা নয় মিস্টার লুলু। এতে দরিদ্র ভারতবাসীর কী লাভ হবে। ভারতবর্ষের বহু কোটি লোক টেলিফোন জীবনে একবারও ব্যবহার করেনি বা তারা রেল অফিসেও কোনোদিন টেলিফোন করবে না।

লুলু গম্ভীরভাবে বলে—সরকারের বর্তমান নীতিই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে জনসাধারণের হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে টেলিফোন পেঁছে দেওয়া। প্রত্যেক টেলিফোনের সঙ্গে নোটিশ দেওয়া থাকবে: নমস্কারের জন্য রেল বা সরকারী অফিসে টেলিফোন করুন।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বলি—কিন্তু টেলিফোন করার জন্য তো পয়সাও দিতে হবে মিস্টার লুলু।

—তা হবে। তবে নমস্কারটা ফ্রী পাওয়া যাবে।

কোলের ওপর নোটবই রেখে লুলুর চোখকে ফাঁকি দিকে মন্তব্যটা লিখে নিয়ে আমি বলি—নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উঠেছে এবং বাক্ স্বাধীনতা।

লুলু আরো দু পেগ টেনে নিয়ে আরো দু পেগের প্রথম কিস্তিতে চুমুক দিয়ে বলে—মানবিক অধিকার ভারী সুন্দর কথা, কিন্তু মানে হয় না। অন্তত সতেরোটা ডিকশনারি খুঁজেও অর্থ বের করতে পারিনি।

আমি লুলুর ভুল শুধরে বলি—মানবিক নয়, নাগরিক।

—ওঃ! বলে লুলু হেসে বলে—তাই বলুন। নাগরিক অধিকার! আমি মানবিক ভেবে এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! আসলে মানুষ এবং নাগরিক কথা দুটোই আলাদা, অর্থও দুরকম। নাগরিক মানেই কিন্তু মানুষ নয়। এ কথাটা মনে রাখলে আর কোনো গোলমাল থাকে না।

আমি একটু গোলমালে পড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—নাগরিক এবং মানুষ কি আলাদা শ্রেণী?

—আলবাৎ! লুলু প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে। চোঁ করে হুইস্কি টেনে নিয়ে আমার খুব নিচু গলায় বলে—আসলে কোনোটারই মানে হয় না।

আমি একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলি—কিন্তু···

—মূর্খ সাংবাদিক, আপনি অকারণ সময় নষ্ট করছেন। চারদিকে এখন জরুরী অবস্থা। আমাদের প্রয়োজনগুলিও অত্যন্ত জরুরী। সময় নেই। আয়ু বয়ে যাচ্ছে, একদম সময় নেই। দেরি করলে যৌবন ফিরে যাবে, বসন্ত শেষ হবে। উঠে পড়ুন।

লুলুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি তার আদেশে উঠে পড়লাম।

গাড়ি করে লুলু আমাকে এক বিশাল ম্যানসনে নিয়ে গেল। এত বড় একটা বাড়ি কলকাতার মহার্ঘ প্রায় বিঘে দুই জমিতে কি করে জমিয়ে বসেছে তা

ভাববার কথা।

স্বয়ংক্রিয় লিফটে ওপরে উঠতে উঠতে লুলু আমার দিকে চেয়ে মহা বদমাশের মত মুচকি হেসে বলে—এ বাড়িতে আমার প্রায় আধ ডজন প্রেমিকা থাকে।

বলে লুলু আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগল। আমি যতদূর সম্ভব মুখখানা ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করতে করতে বললাম—থাকতেই পারে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

লুলু হাসল না। খুব গম্ভীর মুখে ভ্রূকুটি করে বলল—থাকতেই পারে কেন? আর স্বাভাবিক ব্যাপারই বা কি করে হল?

মুশকিলে পড়ে বললাম—বিজ্ঞান বলে পুরুষেরা বাই নেচার বহুগামী।

লুলু—তাহলে আইন করে একাধিক বিয়ে বন্ধ করা হল কেন? যদি জানোই যে, পুরুষরা বহুগামী তবে তাদের সেই গমনপথে গর্ত খোঁড়ার মানে কি? পচা রিপোর্টার, অনেক লোক যদি বউ থাকা সত্ত্বেও আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে শোয় তবে তোমরা তেমন গা করো না। বোধহয় তোমরা নিজেরাও শোও। কিন্তু এক জন ভদ্রলোক যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তবে সেটা তোমাদের কাছে খবর হয়ে দাঁড়ায়, বন্ধু সাংবাদিক, তুমি কি জানো তোমার কতটা ইররাশনাল?

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, কোনো মেয়ের সঙ্গে শুই না। ইন ফ্যাক্ট আমি এখনো সুযোগই পাইনি। আমার আছে সোশ্যাল স্ট্যাণ্ডিং, সামাজিক সম্মানবোধ এবং নিজের স্ত্রী সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভয়—সেই কারণে ইচ্ছে থাকলেও আমি চরিত্রহীন হতে পারছি না।

লুলু খুবই স্নেহের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে 'তুমি' থেকে আবার আপনিতে ফিরে গিয়ে বলে—রিপোর্টার মহোদয়, এবার বুঝতে পারছেন তো আপনার মতো একটি ছাগলের পক্ষে নাগরিক স্বাধীনতা কত অর্থহীন একটি শব্দ! এমন কি দেশ জুড়ে যেসব নাগরিক রয়েছে তারাও অধিকাংশই মানুষ নয়, আপনারই মতো ছাগল! নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য মহিলার সঙ্গে শোওয়ার ইচ্ছে ও স্বাধীনতাকে তারা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছেন। সুতরাং নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে আপনারা কী করবেন?

কত তলায় লিফ্ট থেমেছে তা আমি লক্ষ্য করিনি। দোর খুলে লুলু বেরোলো। সঙ্গে আমিও। খুব ঝকঝকে করিডোর দিয়ে লুলুর পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম কিন্তু বাক্ স্বাধীনতা? মিস্টার লুলু, স্বাধীনতার ব্যাপারটা নিয়েও কি আপনি ভাবছেন না?

লুলু সে কথার জবাব না দিয়ে পিতলের পাতে নম্বর লেখা একটা দরজায় কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে বছর পঁয়ত্রিশের এক অসাধারণ সুন্দরী দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে লুলুকে দেখতে দেখতে তার মুখ ভাবালু এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেল। চোখ আলোয় ভরে উঠলো, ঠোঁট টসটস করতে লাগল, সমস্ত শরীর প্রত্যাশায় ভারসাম্য হারিয়ে টলোমলো করছিল।

লুলু দুহাতে তাকে শরীরের মধ্যে টেনে নিয়ে, চুম্বন করে এবং বলে—

যা বলে তা অবশ্য লেখা যায় না। চূড়ান্ত ভালবাসার অসভ্যতম কথা সব। আমি চোখ নামিয়ে নিই এবং না শোনার ভান করতে থাকি।

লুলু সশব্দে তার দশম চুম্বন শেষ করে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ টিপে বলে—গেঁতো রিপোর্টার, নোট নিচ্ছ না যে বড়? আমি যা বলছি এবং যা করছি এ সব কি ইম্পর্ট্যান্ট নয়? না কি তুমি আমাকে ঠিক গুরুত্ব দিতে চাইছ না?

আমি অনিচ্ছুক আঙুলে ডটপেন বাগিয়ে ধরি কিন্তু লিখতে হাত সরে না।

লুলু বলল—স্কাউন্ড্রেল ছোটোলোক ইডিয়ট!

লুলুর গুরুত্বের কথা ভেবে আমি চুপ করে থাকি। এমন কি একটু হাসবারও চেষ্টা করি।

লুলু ঘরে ঢোকে এবং ইশারায় আমাকেও ঢুকতে বলে। আমি ঘরে ঢুকলে লুলু দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে—এবার বলো। আমি অভয় দিচ্ছি, তোমার কোনো ক্ষতি করব না।

আমি মুশকিলে পড়ে বলি—কী বলব?

লুলু অবাক হয়ে বলে—তোমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না?

—না তো!

—ধূর্ত! খল! মিথ্যেবাদী! আমাকে তোমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না?

ভয় পেয়ে বলি—না। কিছুই না।

লুলু এবার হা-হা করে হেসে বলে—তোমার সামনেই একটা নষ্ট মেয়েকে চুমু খেলাম; অসভ্য কথা বললাম, তোমাকে না হক্ গালাগাল দিলাম, অথচ তোমার কোনো রি-অ্যাকশান হচ্ছে না? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য মহাত্মা রিপোর্টার? বরং তোমার এখন আমাকে খিস্তি করতে ইচ্ছে করছে, লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। বলো, করছে না? কিন্তু হায়, তোমার সেই বাক্ স্বাধীনতা তুমি কখনোই কাজে লাগাবে না। শোনো কাপুরুষ, আমার যদি কখনো কাউকে শুয়োরের বাচ্চা বা বেজন্মা বলতে ইচ্ছে করে তবে আমি বলি, তুমি কেন পারো না বলতে?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—ভদ্রতাবোধে বাধে।

লুলু হা-হা করে হেসে ওঠে বলে—তাহলে বাক্ স্বাধীনতা দিয়ে তুমি কি করবে ভীতু সাংবাদিক? যখন যা মনে আসবে তা যদি বলে ফেলতে পারো তবে তোমার বাক্‌স্বাধীনতা আছে, যদি না পারো তো নেই।

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম—গালাগাল দেওয়ার অধিকারই তো একমাত্র বাক্-স্বাধীনতা নয় মিস্টার লুলু। পলিটিক্যাল ইডিওলজি নিয়ে যে মত-বিরোধ, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা তাই যদি না করা যায়…

লুলু আমাকে একদম পাত্তা না দিয়ে তার ভাঁটানো যৌবনের সুন্দরী প্রেমিকার দিকে এক পা এগোলো। ঘরের মাঝখান থেকে তার প্রেমিকাও স্খলিত চরণে এগিয়ে আসে এক পা। তাদের দুজনেরই মুখচোখে আনন্দের মোহ, তীব্র কাম ও বিহ্বলতা তবু সে অবস্থাতেও লুলু আমার দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চাপা স্বরে বলে—নোট নাও বন্ধু, সব কিছু নোট করে নাও। প্রত্যেকটা স্টেপ লক্ষ্য করো। সঙ্গম শেষে আমি আমার প্রেমিকাকে খুন করবো। খুব লক্ষ্য কোরো ব্যাপারটা…

আমি চোখ বুজে ফেলি এবং কানে আঙুল দিই। এবং ঐ অবস্থাতেই সোফায় বসে আমি ঘুমিয়েও পড়ি। কিছুক্ষণ বাদে লুলুই আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগায়। আমি চোখ মেলতেই লুলু বিরক্তির গলায় বলে‐ ড্যাম ইনএফিসিয়েন্ট!

লুলুর পদমর্যাদার কথা মনে রেখে আমি বলি—আজ্ঞে।

একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কাচে ছায়া দেখে টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে লুলু বলে— রিপোর্টার, লাভ-হেট রিলেশন বলে কী একটা কথা আজকাল চালু হয়েছে না? অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের প্রিয় বা প্রেমাস্পদকে একই সঙ্গে ভালবাসি এবং ঘৃণা করি? আমারও ঠিক সেই অবস্থা। আমি আমার সব প্রেমিকাকেই কেন ঘৃণা করি এবং ভালবাসি বলো তো? এর আগে আমি আমার চৌদ্দজন প্রেমিকাকে খুন করেছি।

বাস্তবিকই লুলুর প্রেমিকাকে ঘরে দেখা যাচ্ছিল না। উপরন্তু সেণ্টার টেবিলের ওপর লুলুর সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার পড়ে আছে। ঘরের বাতাসে বারুদের কটু গন্ধ। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে সোজা হয়ে বসি এবং বলি— মিস্টার লুলু, আপনি তাহলে সত্যিই আপনার প্রেমিকাকে খুন করেছেন? সর্বনাশ।

লুলু অবাক হয়ে বলে—খুন করার কথাই ছিল যে!

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপতে থাকে, আমি চিৎকার করে বলি—বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে মিস্টার লুলু। আমি এক্ষুনি পুলিশের কাছে যাচ্ছি। আপনি যত বড় মাতব্বরই হোন. এর জন্য আমি আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো।

মহান লুলু বোধহয় এই প্রথম একটু ভয় পেল। তার চোখে-মুখে দ্বিধা ফুটে উঠেছে। একটু চাপা ধমকের স্বরে সে বলে—চুপ করো মূর্খ। আশে-পাশে কেউ শুনে ফেলবে।

আমি চেঁচিয়েই বলি—কিন্তু এটা যে খুন মিস্টার লুলু। আমি এটা চেপে রাখতে পারি না।

লুলু ব্যথিত মুখে চেয়ে বলে—বোকা, ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখ। পুলিশের কাছে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী ভাল কাজ হবে না-যাওয়া। এ ব্যাপারটা চেপে রাখার জন্য তোমাকে আমি অনেক টাকা দেবো। অনেক টাকা,

যত টাকা—তোমার দশ বছরের বেতনের চেয়েও বেশী। উপরন্তু পুলিশের কাছে গেলে মামলা মোকদ্দমা এবং তজ্জনিত নানা ঝামেলায় তোমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। আর একটা কথা—বলে লুলু তার রিভলবারটা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাক্ করে বলে - ইচ্ছে করলে টাকার বদলে অন্য উপায়েও আমি তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি।

লুলু হাসল। আমার শরীরে ঘাম দিল। শ্বাস ছেড়ে আমি বললাম—কত টাকা ?

—দু' লাখ।

আমি রুমালে কপালের ঘাম মুছে বললাম—আড়াই।

লুলু রিভলবার পকেটে পুরে নিয়ে আলমারি খুলল। কয়েকটা নোটের বাণ্ডিল আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল —এই টাকা দিয়ে একদিন আমি জিনিকে কিনে নিয়েছিলাম। এই টাকার হুকুমেই জিনি তার অন্য সব প্রেমিককে ভাগিয়ে দিয়েছিল। আজ সেই টাকায় তোমাকে কিনছি রিপোর্টার। কে জানে এই টাকাতেই কখনো আর একজনকে কিনতে হবে কি না।

আমি টাকার বাণ্ডিলগুলো ছুঁয়ে থেকে একটু শিউরে উঠি। বলি—আপনি আমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন না তো মিস্টার লুলু ?

লুলু গম্ভীর হয়ে বলে - না। কিন্তু এ ধরনের রোজগারে কিছু রিস্ক যে সব সময়েই থাকে, তা আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আমাকে ভয় দেখাবেন না মিস্টার লুলু, আমার হার্ট খুব ভাল নয়।

লুলু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পুরো প্রসঙ্গটি অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে বলে—আপনি নাগরিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী যেন জানতে চাইছিলেন ?

পাশের ঘরেই হয়তো জিনির মৃতদেহ পড়ে আছে। পরিস্থিতিটা খুবই অস্বাভাবিক। তবু নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকে আমি নোটবই বের করি এবং আগ্রহের গলায় বলি—দয়া করে বলুন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আনমনা হয়ে যায় লুলু। টাইয়ের ল্যাজে আদর করে হাত বোলাতে বোলাতে উল্টোদিকের সোফায় বসে আপনমনে বলতে থাকে—ভালবেসে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে, ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে, অবহেলা করে দেখিয়াছি মেয়ে-মানুষেরে…

—মানে ? আমি কিছু অবাক হই।

লুলু হাই তুলে বলে—লিখে নাও, আমরা চাই ভালবাসার বা সঙ্গমের স্বাধীনতা, ঘৃণা করার স্বাধীনতা, খুন করার স্বাধীনতা।

মিস্টার লুলু ! আমি মহান লুলুকে তার মন্তব্য সম্পর্কে সাবধান করার জন্য একটু ধমকের সুরে বলি।

লুলু আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলে—তুমিও কি তাই-ই চাও না রিপোর্টার? ভেবে দেখ, খুব ভাল করে ভেবে দেখ, একজন অ্যাভারেজ ভারতবাসী - সে চাকরে, বেকার বা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার যাই হোক—তার মোটামুটি চাহিদাটা কী? সে কিসের স্বাধীনতা চায়? কিসের অধিকার তার কাম্য? ভেবে দেখ রিপোর্টার, ব্যক্তিগত জীবনে তুমিও চাও ভালবাসা বা আনন্দের স্বাধীনতা। এরপর সামাজিক জীবনের কথা ভেবে দেখ। দেখবে প্রতিনিয়ত রোজ রোজ রাস্তায়, ঘাটে, অফিসে, দফতরে যত লোকের সঙ্গে তুমি মুখোমুখি হচ্ছো, তাদের প্রায় অধিকাংশকেই তুমি ঘৃণা করো কি না। করো, তার কারণ তাদের অধিকাংশের আচার ব্যবহার, কথা, ইডিওলজির সঙ্গে তোমার মিল নেই। তৃতীয়ত, ভেবে দেখ, তুমি যাদের ঘৃণা করো, যাদের সঙ্গে তোমার ভাবনা চিন্তা বা বিশ্বাসের অমিল, তোমার স্ত্রী বা প্রেমিকা—যাদের কাছ থেকে তুমি যতটা চাও তার অর্ধেকও পাও না তাদের কাউকে কাউকে তুমি জেনুইনলি খুন করতে চাও কি না। এবং সেই হননেচ্ছাকে প্রতিদিন তুমি ভদ্রতাবোধ, শিষ্টাচার, মায়া-মমতা ইত্যাদি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখছো কি না। ধরো, যদি আজ একটা আইন করে বলা হয়, কেউ খুন করলে তার ফাঁসি বা জেল হবে না, কোনো শাস্তিই দেওয়া হবে না তাকে, তাহলে তোমার কি মনে হয় না যে আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে লক্ষ লক্ষ লাশ পড়ে যাবে?

—আমি জানি না মিস্টার লুলু।

—জানো জানো, স্বীকার করো না। বন্ধু রিপোর্টার, আমরা আসলে এই স্বাধীনতাগুলি চাই। লিখে নাও।

আমি ঘামতে ঘামতে লিখতে থাকি।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। আমি লিখতে গিয়ে দেরি করে ফেলি। কোনোক্রমে লুলুর শেষ কথাগুলি টুকে নিয়ে যখন ধাঁ করে উঠে দাঁড়াই, তখনই হঠাৎ সামনে দেখি জিনির ভূত দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। মুখে লোল হাসি এবং বিলোল মুগ্ধতা।

ভয় পেয়ে আমি আবার সোফায় বসে পড়ে আড়াই লাখ টাকায় গর্ভবতী আমার ব্রীফ-কেস চেপে ধরি বুকে। জিনি এসে আমার পাশে বসে। আমাকে ছোঁয় এবং বলে—আই অ্যাম ফর সেল।

—তুমি মরোনি জিনি? আমি বলি।

—মরেছি হাজার মরণে। জিনি বলে এবং হাসে।

আমি বুঝতে পারি যে, আড়াই লাখ টাকা আমি রোজগার করতে পারিনি। বুঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কিছুদিন আগে রাইটার্স বিল্ডিংসে আমি একজন মন্ত্রীর ব্রিফিং নিতে যাই। মন্ত্রীর সঙ্গেই যখন করিডোরে বেরিয়ে আসি, তখন বাইরেটা ঘন মেঘে কালো, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। মন্ত্রী আর আমি রেলিঙে ভর দিয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকি। উনি তখন বলছিলেন, ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টের

ফ্যাংশনে দেওয়া ওঁর বক্তৃতাটা আমি কাগজে সবটুকু দেবো কি না। আমি ওঁকে আশ্বাস দিচ্ছিলাম। আর তখন হঠাৎ সেই বর্ষা সমাগমের সৌন্দর্য দেখে আনন্দিত মন্ত্রী গুনগুন করে গেয়ে ওঠেন —আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে…। ঋতু বিচার করলে খুবই ভুল গান। কিন্তু তবু সেই অতুলন বৃষ্টির দৃশ্য দেখে তাঁর হৃদয় যে নেচেছিল, তা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। কিছুক্ষণ উনি তো কাগজে ওঁর স্টেটমেন্টের কতটা ছাপা হবে, সেই দুশ্চিন্তা ভুলে ছিলেন।

বলতে কি আমিও এই প্রবল সংকটের সময়ে গুনগুন করে গেয়ে ফেললাম —আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে…

জিনি এগিয়ে আসে। মুখে-চোখে বিহ্বল আসঙ্গলিপ্সা, সম্মোহিত স্খলিত বিভঙ্গ। আমিও কি রকম হয়ে যেতে থাকলাম।

কয়েক মাসের মধ্যেই জিনি তার আড়াই লাখ টাকা আমার কাছ থেকে বের করে নিল।

কংগ্রেসের বিপুল পরাজয় ও জনতা পারটির ক্ষমতায় আসার পর আমি আবার লুলুর কাছে যাই। দেখি, মহান লুলু আগের মতোই তার চেয়ারে বসে, টেবিলের ওপর পা।

বলি—মিস্টার লুলু।

—আপনি বোধহয় কোনো রিপোর্টার।

—আজ্ঞে। আমাকে চিনতে পারছেন না তো! এক সময়ে আপনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

লুলু নির্বিকারভাবে বলে—এখনো করি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে চিনি।

তার অর্থ?

—ধরুন ভারতবর্ষের কোনো মহান নেতা কোটি কোটি দেশবাসীকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। দিনরাত তাদেরই মঙ্গল চিন্তা করছেন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রত্যেককে তাঁর চিনতে হবে। এও নয় যে, একজন দুজন দশজন বা দশ হাজার জন ভারতবাসী না খেয়ে থাকলে, ভিক্ষে করলে, চুরি জোচ্চুরি রাহাজানি করলে, বন্যার কবলে পড়লে বা মরলে তাঁকে বুক চাপড়াতে হবে। এমন কি সারা দেশের মানুষের প্রত্যেককে একবার করে কুশল প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর এক জীবনের আয়ুতে কুলোবে না। সুতরাং স্নেহ বা ভালবাসার সঙ্গে চেনা-পরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমি সবাইকে ভালবাসি, কিন্তু নেসেসারিলি সবাইকে চিনি না।

আমি বিনীতভাবে বলি—বিখ্যাত ও মহানদের ক্ষেত্রে এটা খুবই সত্য কথা।

লুলু হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বলে—সে যাকগে। আপনি কি কংগ্রেসের পতন এবং জনতার অভ্যুদয় সম্পর্কে জানতে চান?

—হ্যাঁ, এই পতন অভ্যুদয়ের কথা যদি বলেন।

লুলু উদাস গলায় বলে—জরুরী অবস্থা জারি করাটা খুবই খারাপ হয়েছিল,

আর তার ফলেই কংগ্রেসের পতন।

—কিন্তু মহান লুলু আপনিই বলেছিলেন· আরো সাতাশ বছর আগেই জারি করা উচিত ছিল, কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আরো সাতাশ বছর আগে জরুরী অবস্থা জারি করলে আজ আর তার জারি করার প্রয়োজনই থাকত না।

—শ্রদ্ধেয় লুলু, জরুরী অবস্থায় যে সব বাড়াবাড়ি ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনার মত কি ?

খুবই বাড়াবাড়ি ঘটেছিল। রেল অফিস থেকে নমস্কার জানানোটা তার মধ্যে অন্যতম বাড়াবাড়ি।

—লুলু, আপনার কি মনে হয় না এখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বদলের ফলে নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা ও অধিকার ফিরে এল ? মনে হয় না কি জনগণের ইচ্ছাই এর ফলে জয়ী হয়েছে। এ কি জনগণের এবং গণতন্ত্রের জয় নয় ?

—নিশ্চয়ই। তবে একথাও ঠিক যে, এই দেশে বরাবরই, এমন কি জরুরী অবস্থার সময়েও জনগণেরই শাসন বলবৎ ছিল। এই শাসক জনগণ হচ্ছে তারাই যাদের রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনো মন্ত্রী, কোনো রাজ্যপাল বা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ভালবাসেন, কিন্তু চেনেন না। তাঁরা জনগণের অস্তিত্বর কথা জানেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা কারা সে সম্পর্কে ভাল ধারণা তাঁদের নেই। এই জনগণেরই একজন এক রিকশাওয়ালা বৃষ্টির দিনে সাউথ এন্ড পার্কের এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেওয়ার সময় পাঁচ টাকা নিয়েছিল। আমি তাকে জরুরী অবস্থার কথা বলতে সে খুব কর্তৃত্বের গলায় বলেছিল—তাতে কি ? একই রকমভাবে হাওড়া স্টেশনের এক কুলিও আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করে। প্রিয় সাংবাদিক, আপনি মহান পুলিশদের কথা ভাবুন, আপনি পবিত্র আদালতের কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীদের কথা ভাবুন, আপনি ছোটো এবং বড় ব্যবসায়ীদের কথা ভাবুন, দোকানদারদের মুখশ্রী কি আপনার মনে পড়ে না ? আপনি যে-কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের কথা ভেবে দেখুন। বেকার ছেলেছোকরাদের কথা ভাবুন। এরা সবাই সেই মহান জনগণ। রাষ্ট্রের নামে এ'রাই বরাবর দেশ শাসন করে আসছেন। এদেশে পুলিশ যখন কোনো চোর, ঘুষখোর বা খুনীকে ধরে, তখন আপনার হাসি পায় জানি। কারণ, পুলিশ যাকে ধরে তার সঙ্গে পুলিশের নিজের কোনো পার্থক্য নেই। তবু মনে রাখবেন ওটুকু পুলিশবেশী জনগণের ন্যায্য শাসন। আদালতে যখন আপনাকে হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য গুনোগার দিতে হয় তখন সেটাও জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন বলেই মনে করবেন। দোকানদাররা ভেজাল মাল দিলে, দামে বা ওজনে ঠকালে সেটাও তো জনগণেরই লাভ। পাড়ার ছোকরারা পুজো বা পলিটিকসের নাম করে চাঁদা তুলে যখন মাল খায়, তখন সেটা বেকার জনগণের জন্য জনগণের দেয় বেকার ভাতা বলেই ধরা উচিত নয় কি ?

আমি উত্তেজিত হয়ে বলি—মিস্টার লুলু আপনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন।

লুলু মাথা নেড়ে বলে—না প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক। আমি বলতে চাইছি, এদেশে জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। বরাবরই ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জনগণ এক বৃহৎ ও মহান শক্তি। এই শক্তি জনগণের মধ্যেই পারস্পরিক ক্রিয়া করে। রামকে শাম মারে, শ্যাম যদুকে ঠকায়, যদু মধুর কাছ থেকে চাঁদা তোলে এবং মধু রামকে ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে নেয়। আর এইভাবেই জনগণের বিপুল শক্তি তার ভারসাম্য রক্ষা করছে। আর এভাবেই চলবে। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে আর গভর্নমেন্টের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমরা স্টেটলেস সোয়াইটির কল্পনাকে সার্থক করে তুলেছি।

আমি চোখ কপালে তুলে বলি—বলেন কি মহান লুলু? সরকার না থাকলে যে ভয়ংকর কাণ্ড হবে!

লুলু মাথা নেড়ে বলে—শোনো মূর্খ, সরকার তুলে দেওয়ার কথা আমি বলি না। নটুকোম্পানি বা বহুরূপীর নাটুকে দলের মতো বা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো জনজীবনে উত্তেজনাময় এন্টারটেনমেন্টের জন্য সরকারও থাকবে। একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অন্য একটা রাজনৈতিক দলের তর্জা বা কবির লড়াই চলবে, ভোটযুদ্ধ হবে, সংসদে আজকের মতোই যাত্রার আসর বসবে। সেখানে জনগণের মঙ্গলের জন্য আইন পাস হবে, অর্থ বরাদ্দ হবে, ধাঁধা প্রশ্নোত্তরের আসর বসবে। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে জনগণের নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার কোনো হেরফের হবে না।

আমি ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলি—মিস্টার লুলু, আপনি এ-সব কী বলছেন এ যে সরকারের অসম্মান।

লুলু উঠে দাঁড়ায় এবং জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—সাংবাদিক, এসো দেখ এসে বাইরে কী সুন্দর দৃশ্য।

আমি মহান লুলুর আদেশে জানলার কাছে যাই।

মুহূর্তে দুর্দান্ত লুলু আমাকে পাঁজাকোলে তুলে গরাদহীন জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। আমি বিকট একটা চিৎকার করে চোখ বুজে ফেলি।

কিন্তু পড়লাম না। লুলু আমার একটা হাত ধরে রেখেছে। একমাত্র লুলুর হাতটিই আমার অবলম্বন, পায়ের তলায় পাঁচতলার শূন্যতা। আমি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কাতর স্বরে বলি—হে মহান লুলু, হে দয়ালু লুলু, আমাকে তুলুন।

লুলু আমাকে ধরেই থাকে। ঠিক যেমন দেখেছিলাম "টু ক্যাচ এ থিফ" ছবিতে। ক্যারি গ্র্যান্ট বাড়ির ছাদ থেকে একটা চোর মেয়েকে ঝুলিয়ে রেখে যেভাবে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিল, ঠিক সেইভাবেই লুলু বলল - বলো প্রিয় সাংবাদিক, দিল্লির বা রাজ্যের সরকার এখন তোমার জন্য কী করছে! তুমি যদি এখন মরে যাও তাহলে সরকার কতটা ধাক্কা খাবে? কিংবা তুমি মরে গেলে কিনা সেই সংবাদ কি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির কাছে কোনোদিন পৌঁছাবে? তুমি

যে আছো তাই তাঁরা জানবেন না।

ঝুলতে ঝুলতে আমি লুলুর কথার সত্যতা খানিকটা বুঝতে পারি। বলি—মহান আপনার কথা অতি সত্য।

—মূর্খ সাংবাদিক, সরকার সরকার বলে দিন রাত তোমরা চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছো কিন্তু কোনোদিন বুঝলে না সরকার নয়, তুমি বেঁচে আছো নিজেরই দায়িত্বে। তুমিই তোমার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার জন্য দায়ী। তুমি কবে বুঝবে সরকার নয়, তোমার আশেপাশের সামনের ও পিছনের জনগণই তোমাকে দেখছে, দয়া করছে, ঘৃণা করছে, খুন করছে আবার ভালও বাসছে। মূর্খ, আমি সেই জনগণের এক প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে আজ জিজ্ঞেস করছি, বলো, তুমি এদেশে রাষ্ট্রমুক্ত সমাজের কথা মানো কি না!

আমি নিচের প্রকাণ্ড শূন্যতার দিকে চেয়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠি—মানি।

—বলো গণতন্ত্রের জয়।

—গণতন্ত্রের জয়।

—বলো তুমিই সেই জনগণ।

—আমিই সেই জনগণ।

এরপর মহান লুলু আমাকে টেনে তোলে। তারপর ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার ও গণতন্ত্রের অর্থ বুঝতে আমার আর দেরি হয়নি।

উকিলবাবু এখনো আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড় অফিসার, বড় ডাক্তার, বড় উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড় সে তত ঘোরাবে।

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয়-ভয় আর লজ্জা লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড় দোকান নয়। ছোটো মোটো, গরীবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলা পাতি কালাপাতি চমন বাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামী কোল্ড ড্রিংকস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশী বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছে গুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠাণ্ডা হলে চলবে ?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে —হুঁ।

লজেনচুসের গন্ধওলা ঠাণ্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘৎঘৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উল্টো দিকের বাড়িটার দিকে। না উকিলবাবু এখনো আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল, ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায় ? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড় জোর। আর চাও তো, বেশ ভাল মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয় বার বিয়ে বসতে খুব ভেবে-চিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনী দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কব্জা লাগাচ্ছিল। ইংরিজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝল এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজী যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকাল মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনোদিন হতও না।

—বলি ব্যাপারটা কি, শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

লক্ষ্মী সূক্ষ্ম চিরুনীতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হয় সে তো দিন রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? কেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলী মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

—নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

—জামাই?

—তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড় বড় চোখে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারী ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল ডিভোর্স করবে নাকি?

—তাই তো লিখেছে।

—করলেই হল। আইন নেই?

—ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

—তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বেআইনী ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিসে যেতে।

লক্ষ্মীর মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল—আমি যাবো পুলিসের কাছে? তবে তুমি পুরুষ মানুষ আছো কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনী শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ঐ লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয় নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে মেয়ের গলাগালি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ এক পুরুষ। কীই বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলল—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানী। সব কটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই। কোর্ট কাছারি নেই? পুলিস জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিসের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তির হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গাহেককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে এক উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কিনা দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পঁচিশটা টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনো ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিব ঢিব, মুখ শুকনো গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদী শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে

চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢি-ঢি ফেলে দেবে দু দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ। গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাবো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিন শ টাকা করে হাত-খরচ পাঠাবো তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, এলো চুলে বসে ছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ বুক ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছ? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাবো।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারী মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষ মানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনীমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না। এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে "ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না" শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত পা ধোবেন, জল-টল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা. রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনা আণ্টেকের পর।

—তাহলে আরো দেড়ঘণ্টা ধরে নিন।

—বড় উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

—আসানও হবে। উনি হারা মামলায় জিতিয়ে দেন। কত খুনীকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

—আপনার মুশকিলটা কি?

—সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

—অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরো জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগরেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। শোনা গেল, উকিলবাবু এখনো চেম্বারে আসেন নি। জল খাচ্ছেন বোধ হয়। গুটি গুটি আরো মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাজা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘন ঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড় উকিলবাবু মক্কেলদের এক দুইবার দেখে মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরোনো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে

বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন তো? কিন্তু কী দিয়ে রুখবেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভাল নয় বা কার ভাল এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুণে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

দুই

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম-সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারী আহ্লাদী চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জী দে। এ সময়কার ঠাণ্ডা ভাল না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানও গেয়ে ফেলল সে—না মারো না মারো পিচকারী······

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হার মানায়। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের লেজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝাবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড় আলতুফালতু কথা বলে। মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জেবলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাঙ তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড় সোজা নয় হে।

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল—ও পক্ষ কোন জবাব দিয়েছে?

—জবাব এত টপ করে দেবে? অত সোজা নাকি? যা সব আর্গ্নুমেন্ট দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মুসাবিদা করতে দুদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কি? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

—আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাঁকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

—খরচা আবার কি? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনো মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

—আছে, আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কি আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড় প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু! মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজার দর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় দুটো টাকা দিয়ে আসবখন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহারা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেবো তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কি কি পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কি কি পয়েন্ট সে সব গুছিয়ে ভাবতে হচ্ছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর খুব অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কি? মা খুড়ি একটু ফিচফিচ করত, তা অমন সব মা খুড়িই করে। ভারী বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উল্টে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যে সব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেই সব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

—মারধর করা হয়নি তো?

—কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উল্টে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু একটা সটকান মেরেছি হয়তো। তাকে মারধর বলে না।

—চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

—ছিল কি আর না? তবে সে সব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে। তুমি বরং কাল চারটে টাকাই দিয়ে যেও।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়ে ছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারী সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভাল বলে মনে হল না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আফসোস হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালত তো বড় জোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশী কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারো সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়। ওপরে টিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন বালি গত বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশীর ভাগ বই-ই ডামি। ওপরে মলাট, ভিতরটা ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গত কালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অংক কষাচ্ছে। চারটে টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

তিন

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা

উচিত কিনা ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভাল তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কি?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

নবীনও ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে—ওদিকে সব ভাল?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভাল আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছো। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরিজি কি. উকিলের মুখের কথাও ভাল বোঝা যায় না। দু বারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতেই চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

—কারো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে-আইনী। পুলিশ খবর পেলে জেল দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল—হাসছো বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কী ভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে।

লোহা-পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্টং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।

এ কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশী বলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছো? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

এ কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চার

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভাল লাগে না উদাস লাগে, এই যে দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারী আলাদা মনে হয়, এই যে

সিনেমা দেখেও মন ভাল হতে চায় না—এই তার রোগ। ভিতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-চ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে আছে।

সিনেমা-হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনো কাজের জন্য কখনো কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ী কুকুরটা ভ্যাকভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে ফুইফুই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে। লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে না-বলতেই চুলের গোছায় বিভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দুনম্বর বোমার মতো। মেঝেয় পড়তে না-পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেয়েছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে না-বলতেই আর একটা তত জোরে নয় থাপ্পড় পড়ল গালে।

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়টি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! মনের ম্যাদামরা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত! আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ঙ্কর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে!

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে! এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জ্বলজ্বলে চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার ছিল লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা

ফোড়ার যন্ত্রণার মতো ব্যথাটা আজ যেন কেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাপকে। মার খেয়ে মুখ-চোখ বিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দুখানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন ?

নবীনও সায় দিল—রাত হয়েছে, যাওয়ার দরকারটা কি ?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলে—ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো !

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

বন্দুকবাজ

পল্টনের একটাই গুণ ছিল। সে খুব ভাল বন্দুকবাজ। বন্দুক বলতে আসল জিনিস নয় হাওয়া-বন্দুক। চিড়িয়া, বাঘ এমন কি ইঁদুর মারার যন্ত্রও সেটা নয়। তবে অল্প পাল্লায় চাঁদমারী করা যায় বেশ, আর পল্টনের হাওয়া বন্দুকটা ছিল ভাল। তার জমিদার দাদু জার্মানী থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন।

জীবনটাকে প্রথম খাট্টা বানিয়ে ছাড়ল ইস্কুলের মাস্টাররা, আর বাবা। দিনরাত কেবল পড় পড়। শেষমেষ 'পড় পড়' শব্দটা তার কানে আরশোলার মত ফড়্ফড় করে বেড়াত, মাথার মধ্যে ফরর, ফরর করত।

বন্দুকবাজ ছিল তখন থেকেই।

দাদুর জমিদারী বাবা বিফলে দিল। তারপর থেকে শুখা ভদ্রলোক তারা। নিমপাতা দিয়ে ভাত খায়।

বাবা কেবল হুড়ো দেয় তখন—মানুষ হ। দাঁড়া। নইলে মরবি।

পল্টন জানে, বাবা এখন ছেলের মধ্যে তাগদ চায়। বাপ নিজে সুপুত্র ছিল না। তবে খারাপ দোষও কিছু নেই। চটপট বড়লোক হতে গিয়ে ফটাফট টাকা বেরিয়ে গেল। জমি গেল। বাড়িটা রইল শুধু। তা সে বাড়িরও ছুরত কিছু নেই। রংচটা দাদের দাগ সর্বাঙ্গে।

পল্টনের মাথায় পড়া ঢোকে না বাপের হুড়ো খেয়ে বই মুখে হরবখত ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করত বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পায়ের ছাপ পড়ত না মাথার ঘিলুতে। তবে বন্দুকের নিশানা ছিল ওয়াঃ ওয়া। বিশ হাত দূর থেকে উল্টো করে ধরা পেনসিলের শিস উড়িয়ে দিত একবারে। টান করে সুতো বাঁধো, পল্টন বিশ হাত দূর থেকে ছর্রা মেরে ছিঁড়ে দেবে। কোন কাজে লাগে না গুণটা। কিন্তু আছে। অচল সিকি যেমন পকেটে পড়ে থাকে।

তার পথে বরাবরই নানান্ মাপের গাড্ডা। কখনো ছোট কখনো বড়। ক্লাস নাইনে সে প্রেমে পড়ল গার্লস স্কুলের পপির সঙ্গে। পপি পড়েনি। পড়াটা পল্টনের একতরফা। না পড়ে উপায়ই বা কী? হুবহু মেমসাহেবের মত দেখতে পপি, তেমনি সাজগোজ তার, আর রাজহাঁসের মত অহংকারী সে। পুরো গঞ্জের যুবজন ঢেউ খেয়ে গেল।

পপি কখনো বিনা ঘটনায় রাস্তায় হাঁটতে পারত না। রোজ কিছু না কিছু

ঘটবেই। এক ছোকরা স্রেফ হীরো বনতে গিয়ে বাঘী সিপাহীর মত দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পপির চোখ টানতে গিয়েছিল। দুটো ঠ্যাং বরবাদ।

আর একজন স্রেফ পপির জন্য গার্লস স্কুলের পুকুরে তেত্রিশ ঘণ্টা সাঁতরাল। নিউমোনিয়া হয়ে সে যায় যায়।

আর একজন কেবল পপির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর পেটে ছুরি চালিয়ে দিল। একজন জেল, অন্যজন হাসপাতালে গেল।

অনেকে গান শিখতে লাগল, ফুটবল খেলতে লাগল, ছবি আঁকতে লাগল, গল্প বা কবিতা লিখতে লাগল সব পপির জন্য।

পপি কি ভালবাসে? কি পছন্দ করে তা তো কারো জানা ছিল না।

পল্টনের আর কিছু নেই, বন্দুক আছে। এক বাজীকর বাজী দেখিয়ে মাতা মেরীর আশীর্বাদ পেয়েছিল। গল্পটা জানত পল্টন। বাজীতে যদি হয় তো বন্দুকে হবে না কেন? পল্টন গিয়ে ডালিমের সেলুনে চুল ছাঁটল সেদিন, সবচেয়ে ভাল হাফ প্যাণ্ট আর শার্টটা পরল। আর জুতোও পরল, যা সে কদাচিৎ পরে।

আমতলার রাস্তা দিয়ে পপি ইস্কুলে যাচ্ছে। সঙ্গে হরেক কিসিমের ফুরফুরে মেয়ে। সব ডগমগ। আর আড়াল আবডালে, আগে পিছে ছোকরারা নানা কায়দা করে চোখ টানার চেষ্টা করছে।

পল্টন ঠিক করল, দেখাবে। পপির বাঁ বুকের ওপরে সাঁটা ইস্কুলের মেটাল ব্যাজ। বেশ ছোট ব্যাজ। পল্টন আমগাছের আড়াল থেকে বন্দুক তাক করল। বেশ শক্ত কাজ। প্রথম, পপি চলছে। দ্বিতীয়, তার চারদিকে বিস্তর চেলী চামুণ্ডী। কিন্তু বন্দুকবাজ পল্টন তো আর কাঁচা হাতের লোক নয়। সে ব্যাজটাকে ভাল মত নিরীখ করে ঘোড়া টিপে দিল। ব্যাজটাকে টিপে দিয়ে লোহার গুলি লাফিয়ে উঠে পপির পা ছুঁল ভয়ে। কিন্তু ফসকায়নি।

কিন্তু পপির চোখের সামনে রুস্তম বলবার সাধ যারা এতকাল ধরে পুষছে তারা ছাড়বে কেন?

পপির লাগেনি, অলৌকিক হাতের টিপ পল্টনের। টিনের ব্যাজটা টোল খেয়ে গেছে। কিন্তু তখন কে শোনে তার কথা।

ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝবার আগেই তার মাথা থেকে সিকি চুল খামচে তুলে নিল ছোকরারা, পেট ফাটানো লাথি চালাল, নাক থ্যাবড়া করে দিল ঘুষিতে। তিনটে দাঁত নড়বড়।

প্রথমে ভয় খেলেও মার দেখে খুব হেসেছিল পপি আর তার বান্ধবীরা।

বন্দুকটা সেই গোলমালেও বেঁচে গিয়েছিল। সেটার ওপর কেউ কেন কে জানে আক্রোশ দেখায়নি।

মারে শেষ হল না। ইস্কুলে খবর হল। পরদিনই তার বাবার কাছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গেল ইস্কুল থেকে। ব্যথা বেদনার শরীরের ওপর বাবা আর এক

দফা চালাল। সেই রাতেই বন্দুক ঘাড়ে রাস্তা মাপল পল্টন। একটু খুঁড়িয়ে, ফুঁকিয়ে, মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে।

ভোর হল শহরতলীতে। লেভেল ক্রসিং-এ একটা ফাঁকা গুমটি ঘর পেয়ে শুয়ে গিয়েছিল পল্টন। ভোর হল প্রচণ্ড খিদেয় পিপাসায়। ভোর হল ভয়ে।

কিন্তু ভোর তো হল!

পল্টন ভারী শহরে ঢুকে চারদিক দেখে। বাবার সঙ্গে বহুবার এসেছে, তখন খারাপ লাগেনি। এখন মনে হল, ই বাবা, এখানে আবার না জানি কি হবে! কিন্তু ডরফোকের ইজ্জত নেই। সঙ্গে বন্দুক তো আছে এখনো। প্রথমে পল্টন তার আংটি বেচল। তারপর খেল পেট ভরে।

বাজারের কাছে বন্দুক হাতে ঘোরাঘুরি করার সময় বহু লোক তাকে ফিরে ফিরে দেখতে থাকে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে পিছুও নেয়। একটা ছেলের হাতে আধ খাওয়া জিলিপি। পল্টন তাকে বলল, জিলিপিটা ধরে দাঁড়া।

ছেলেটা দাঁড়ায়। বিশ হাত দূর থেকে পল্টন বন্দুক মারে, জিলিপি পড়ে যায়।

ছেলেটা কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু বহু লোক তাকে সাবাস দিতে থাকে।

তো পল্টনের পয়লা কাম সাফা, এ কাজটা হল সবচেয়ে শক্ত কাজ। ঢোকা। ঢুকে পড়া। পল্টন পয়লা গুলিতেই শহরে ঢোকার রাস্তা করে নিল।

সে যোগাড় করল আলপিন, ছুরি, টমেটো, আলু, সুতো আর যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস আছে। ছুরির মাথায় টমেটো গেঁথে, সুতো ঝুলিয়ে, আলপিনের ডগা লক্ষ্য করে সে দমাদম বন্দুক মারে। একটা তাস দাঁড় করিয়ে যে কোন ফোঁটায় গুলি লাগায় দশ বিশ হাত দূর থেকে। গুলি ফসকায় না। মোমবাতির শিখা নিভিয়ে দেয়, উড়ন্ত মার্বেল ছটকে দেয়।

দিনে দেড় দু'টাকা রোজগার দাঁড়াল। কোই পরোয়া নেই। একটা চালের আড়তে পাহারা দেওয়ার কাজ পেল, সেইখানেই মাথা গোঁজার জায়গা আর দু' বেলা খাওয়া। সারাদিন শহরের এখানে সেখানে বন্দুকবাজী। তবে ভুলেও সে আর মেয়েদের দিকে তাকায় না। ওপড়ানো জায়গায় ফের চুল গজাতে অনেক সময় লেগেছে।

তো বন্দুক আর পল্টন আছে। আর কি চাই?

আড়তের মালিক চেঁটুবাবুর আসলী বন্দুক আছে। দুটো নল দিয়ে আগুনে সীসে ছটকায়। চেঁটু বলে—চালাবি?

উদাস স্বরে পল্টন বলে—ও বড় ভারী জিনিস।

দূর ব্যাটা! অভ্যাস কর।

পল্টন আসল বন্দুকের খদ্দের নয়। সে কোনদিন পাখি মারেনি, বাঘ মারেনি, বেড়াল পর্যন্ত নয়। জীবজন্তু মারতে বড় কষ্ট হয়। আসল বন্দুকে তার তবে কাজ কি?

কিছুদিন যায়। হাওয়া বন্দুকের খেলা শহরে পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন আর কিছু না দেখালে লোকে তাকাবে কেন?

খুব ভাবে পল্টন। সে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে, হেঁটমুণ্ডু হয়ে বহু লক্ষ্যভেদ দেখিয়েছে। কিন্তু তাও তো সব দেখা হয়ে গেছে মানুষের। আর কি বাকি আছে? রাতের বেলা হাওয়া বন্দুক কোলে নিয়ে পল্টন জেগে বসে আড়ত পাহারা দেয় আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে একদিন চেণ্টুবাবুকে বলল—বন্দুক ছাড়া আর তো কিছু জানি না। তা বললেন যখন তো দিন আপনার মারণ কল। চালাই।

পারবি তো?

প্র্যাকটিস তো করি!

চেণ্টুবাবু বন্দুক দিলেন। বললেন—গুলির বড় দাম। সাবধান, বেশী খরচ করিসনি।

খুবই ভারী বন্দুক, হাওয়া বন্দুকের পাঁচগুণ। চেণ্টুবাবু তাকে নিয়ে এক ছুটির দিনে শহরের বাইরে গেলেন বন্দুক শেখাতে।

সারাদিন দমাদম চাঁদমারী হল। দিনের শেষে চেণ্টুবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তুই শালা একলব্যের বংশ।

মিথ্যেও নয়। আসলী চীজ পয়লা দিন ধরেই পল্টন খেলা দেখিয়েছে। পিসবোর্ডে আঁকা গোল টার্গেটের ঠিক মাঝখানে একটার পর একটা গুলি পাম্প করে দিয়েছে; এদিক ওদিক হয়নি চেণ্টুবাবু শূন্যে ঢিল ছুঁড়েছেন, আর পল্টন সেই ঢিল ছাতু করেছে। তারপর নারকোল পেড়েছে বন্দুকে, বটের ফল পেড়েছে, সর্বশেষে একটা ওল্টানো কাচের গ্লাসের ওপর রাখা একটা কমলালেবু ছ্যাঁদা করেছে, গ্লাসটার চোট হয়নি।

শহরে শখের শিকারী কিছু কম নেই। পল্টনের বন্দুকের হাত সবাই জেনে গেল। সেই থেকে সে শিকার-পার্টির সঙ্গী। ছুটির দিনে কেউ না কেউ এসে বলবেই, চল রে পল্টন।

পল্টন যায়। নিজের হাতে জীবজন্তু সে মারে না। তবে বন্দুক বয়। গুলি ভরে দেয়। সঙ্গে থাকে। কথা কম বলে সে। কেউ চাইলে বন্দুকের নানা ভেলকী দেখায়। চলন্ত জীপগাড়ি থেকে টার্গেট মারে, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছন ফিরে লক্ষ্যভেদ করে, হেঁটমুণ্ডু হয়ে নিশানায় গুলি লাগায়।

বিশ্বাসবাবু বললেন—তা পাখি মারিস না কেন?

কষ্ট হয় বাবু। পাখির তো বন্দুক নেই। সে উঠে কি চালাবে?

ব্যাটা ফিলজফার!

পল্টন জানে মারটা উভয় পক্ষেই হওয়াটা হক্কের। এক তরফা ভাল নয়। পাখি বন্দুক চালালে সেও উল্টে চালাতে পারত।

চৌধুরী সাহেব বললেন—কিন্তু বাঘ?

—বাঘেরও বন্দুক নেই। তাছাড়া সে তো আমার ঘরে গিয়ে হামলা করেনি।

বরং তার জায়গায় এসে আমিই ঝামেলা চালাচ্ছি।

—তোর কপালে কষ্ট আছে।

সে জানে পল্টন। কপালে কষ্ট তার নেই তো কার আছে!

অফিসারদের ক্লাবে পল্টন চাকরি পেয়েছে। টেনিস বল কুড়িয়ে দেয়, ঘাস ছাঁটে, গল্‌ফের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যায়, মদ ঢেলে দেয়।

একদিন খেয়ালবশে গল্‌ফ স্টিক চালিয়ে বহু দূরের গর্তে বল ফেলল।

মিত্র সাহেব বীয়ারের জাগ হাতে রঙীন ছাতার তলায় বসে ছিলেন। দেখে বললেন—হোল ইন ওয়ান! আবার মারো তো!

আবার মারে পল্টন এবং এবারও গর্তে বল ফেলে।

সেই থেকে পল্টন একনম্বর গল্‌ফ খেলোয়াড়। সেই থেকে সে বিলিয়ার্ডেও সবচেয়ে চৌখস। পল্টন ছাড়া সাহেবদের চলে না। পল্টন ছাড়া ক্লাব অচল।

কাছাকাছি বউ বা প্রেমিকা থাকলে কোন সাহেবই পল্টনের সঙ্গে বড় একটা বিলিয়ার্ড বা গল্‌ফ খেলে না।

গুহ সাহেব নতুন এসেছেন। সুন্দরী স্ত্রী।

[গল্পের নিয়মে গুহ সাহেবের স্ত্রী হতে পারত সেই পাপি। জীবন তো অনেক সময়ে গল্পের মতই হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গুহ সাহেবের স্ত্রী পাপি নয়। অন্য একজন।]

পল্টন বিলিয়ার্ড টেবিলে একা একা বল চালাচালি করছিল। সাহেবরা কেউ আসেনি তখনো।

গুহ সাহেব হাত গুটিয়ে বললেন, হয়ে যাক এক হাত।

হল। হেরে ভূত হয়ে গেলেন গুহ। পল্টন গা লাগিয়েও খেলল না।

পরদিন গল্‌ফে সে গুহ সাহেবকে একদম বুড়বক বানিয়ে ছাড়ল।

কিন্তু গুহ সাহেব বুড়বক হতে পছন্দ করেন না। তিনি বিদেশে বিস্তর গল্‌ফ আর বিলিয়ার্ড খেলেছেন। কম্পিটিশানে শুটিং করেছেন। তাই ক্রমে ক্রমে তাঁর পল্টনের সঙ্গে একটা অদেখা শত্রুতা গড়ে উঠতে থাকে।

শীতকালে জলায় বাঘ আসে। সেবারও এলো। সাহেবরা বন্দুক কাঁধে বাঘ মারতে চললেন। সঙ্গে পল্টন।

জঙ্গলে বিটিং হচ্ছে। জঙ্গলের বাইরে দু'সার বন্দুক তৈরি।

পল্টন দূরে একটা গাছতলা বেছে ছায়ায় বসে আছে। বসতে বসতে ঢুলুনি এলো। শুয়ে গেল সেইখানেই।

বাঘটা বেরোল বিদ্যুৎশিখার মত। তারপর ঢেউ ঢেউ হয়ে ছুটতে লাগল খোলা মাঠ দিয়ে, আগুনের মত উজ্জ্বল শরীরে।

মোট দশখানা বন্দুক গর্জে উঠল দুই সারি থেকে। তারপরেও গর্জাতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, বারুদের গন্ধে বুক ছিঁড়ে যায়।

বাঘটা ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল ধানের ক্ষেতে। তার রক্তে মাটি উর্বর হতে

লাগল। পল্টন শুয়ে ছিল টিলার মত উঁচু জায়গায়। গাছতলায়। সবই ঠিক আছে তার শুধু তোলা হাঁটুটার মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা। তীর বেগে রক্ত বেরোচ্ছে।

যখন সবাই ঘিরে ধরল তাকে সে কাতর স্বরে বলল, সাবাস! লেগেছে ঠিক। ঠিক লেগেছে। সাবাস সাহেব।

কাকে বলল কেউ বুঝতে পারল না। তবে মাসখানেক বাদে গুহ সাহেবের স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা আনলেন আদালতে।

জমা খরচ

কি বুঝছো মুখুজ্জে ? চল্লিশ পেরিয়ে জীবনের এক আধটা হিসেব কষে ফেলা উচিত ছিল তোমার। একদিন ছুটি টুটি দেখে বরং একটা খাতা নিয়ে বসে যাও : একদিকে লেখ জমা, অন্য ধারে খরচ। ঐ যেমন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টরা ডেবিট ক্রেডিট লেখে আর কি ?

জমার ঘরে প্রথমেই লেখ, জন্ম। ওটা প্লাস পয়েণ্ট। একটা আর্নিং তো বটেই। কিন্তু আয়ুটাকে জমার ঘরে রেখো না। জন্মের পর থেকে আয়ু আর জমা হয় না। ওটা খরচ বলে ধরো।

ব্যালানস শীটটার দিকে একবার তাকাও, ভাল দেখাচ্ছে না ? জমা, জন্ম। খরচ, আয়ু।

জন্মের পর একরোখা বহুদূর চলে এসেছো। টর্চের আলোটা একটু পিছন দিকে ঘুরিয়ে ফেলবে নাকি ? মগজের ব্যাটারি এখন আর তেমন জোরালো নয় হে। আলো একটু টিমটিমে। তবু দেখা যায়। একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছো, মাটির দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো ? একটা লেবু গাছ ! আরঐ মস্ত সেই নদী ! শীতে দুধসাদা চর জেগে ওঠে বুকে, ভর বর্ষায় রেলগাড়ির মতো বয়ে যায় !

এসব কোনো খাতেই লিখো না মুখুজ্জে ! ওগুলো না জমা, না খরচ। ঐ সেই বাঘের মতো রাগী লোকটা সন্ধ্যার আবছায়ায় পুবমুখো মস্ত ডেক চেয়ারে বসে আছে বারান্দায় ! চেনো তো ! আর কারো বশ মানেনি কখনো, কেবল তোমার কাছে মেনেছিল। তোমার ইস্কুলের হাতের লেখা পর্যন্ত চুপি চুপি লিখে দিত, ভুলে গেছ ? কোন খাতে ধরবে তোমার দাদুকে ?

জমার ঘরে ধরলে ? ভুল করলে না তো ? একটু ভেবে দেখ। বরং কেটে দাও : কোনো খাতেই ধোরো না।

ময়ূরটার কথা লিখবে নাকি ? সত্যি বটে, গোলোকপুরের জমিদার বাড়ির মস্ত উঠোনে পাম গাছের নিচে ওকে তুমি বহুবার পেখম ধরে থাকতে দেখেছো। চালচিত্রের মতো রঙীন বিস্ময়। কিন্তু বলো, বিস্ময় আমাদের কোন কাজে লাগে ? আমাদের মূলধন জমার খাতে সৌন্দর্যের কোনো ভূমিকাই নেই।

বরং জমার খাতে ধরতে পারো তোমার জেঠিমার হাতে ডাল ফোড়নের

গন্ধটাকে। ঐ অসম্ভব সুন্দর ডাল দিয়ে থাবাথাবি করে কতজন ভাইবোন মিলে এক থালায় ভাত মেখে খেতে।

আর বর্ষায় মুকুন্দর ঘানীঘরের পিছনে যে কদমফুল ফুটত! যদি খুব ইচ্ছে হয় তবে ওটাকেও জমার ঘরেই ধরতে পারো। তবে আমি বলি ফুলটুল জীবনে খুব একটা কাজে লাগে না। কদম ফুল অবশ্য লেগেছিল। পাপড়ি ছিঁড়ে গোল মুণ্ডুটা দিয়ে তোমরা ফুটবল খেলতে শিখলে।

প্রথম এরোপ্লেন দেখার কথা মনে পড়ে? টর্চটা ভাল করে ফেল। দেখতে পাবে। ঐ যে কলকাতার মনোহরপুকুরের সেই দোতলার ঘর? দেশের বাড়ি, নদী, লেবু বন, দাদু সবকিছু থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল তোমাকে। সারাদিন মন খারাপ। পৃথিবী জুড়ে তখন বিশাল এক যুদ্ধ চলছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ পেলেই ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে তুমি। মাথাটা উঁচুতে তুলতে। তুলতে তুলতে মাথা লটকে যেত পিঠের সঙ্গে। এরোপ্লেন যেত ঝাঁক বেঁধে। তার মধ্যে একটা এরোপ্লেন দলছুট হয়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিয়ে আবার উড়ে গেল।

তোমার শৈশব মাখামাখি হয়ে আছে রেলগাড়ি আর এরোপ্লেনে। তোমার ভিতরে জঙ্গল, পাহাড়, নদী, কুয়াশা, চা-বাগান ঢুকে পড়েছিল কবে! আজও তুমি তাই নিজের চারদিকটা স্পষ্ট করে দেখতে পাও না। মাঝে মাঝে ঝুম হয়ে বসে থাকো। তোমার মাথার মধ্যে রেল লাইন দিয়ে গাড়ি বহু দূরে চলে যায়, আকাশ পেরোয় বিষণ্ণ এরোপ্লেনের শব্দ, অবিরল নদী বইতে থাকে। তোমার সময় যায় বৃথা। মুখুজ্জে, এগুলো তোমার খরচের দিকে ধরে রাখো।

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি বহুবার শুনিয়েছো লোককে। কাটিহারের সেই ভোরবেলা, শীতশেষের কুয়াশা মাখা আবছায়ার শিমুল বা মাদার গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল শৈশবের নির্মোক: তুমি জেগে উঠলে। সত্যি নাকি মুখুজ্জে? ঠিক এরকম হয়েছিল?

সেই কোকিলের ডাকের কথা তুমি একদিন বড় হয়ে বলেছিলে তোমার ভালবাসার যুবতীটিকে!

সে বলল, যাঃ।

সত্যি। তুমি বুঝবে না বুলু। এরকমই হয়েছিল।

কোকিলের ডাক আমি তো কত শুনেছি! কোনোদিন আমার সেরকম হয় নি তো!

আঃ, কোকিলের ডাকটাই তো আর বড় কথা নয়।

তবে?

সে যে সেই বিশেষ মুহূর্তে ডেকে উঠল সেইটেই বড় কথা।

বিশেষ মুহূর্তটা কিসের?

শিশু বয়সের অবচেতনার ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ল যে।

যাঃ, বানানো কথা।

মুখুজ্জে, আজও তুমি ঠিক করতে পারোনি, কোকিলটাকে কোন খাতে ধরবে। কিন্তু কোনো না কোনো খাতে ধরতেই হবে যে, ওটা যে তোমার জীবনকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল।

ধরো, জমার খাতেই ধরো।

কোকিলের ডাকের পরেই এল মঞ্জু। মঞ্জুই তো? ঠিক বলছি না। মঞ্জুর মতো সুন্দর মেয়ে সেই বয়সে তুমি আর দেখনি। বব চুল, ফর্সা, টুকটুকে, মেম ছাঁটের ফ্রক। এর কথাও তুমি বহুবার বলেছো।

মঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতে। মঞ্জুও তোমাকে পাত্তা দিত না। কিন্তু সেই বয়সের টান কি সহজে ছাড়ে। ওদের বাড়ির আনাচ কানাচ দিয়ে ঘুরতে, গুলতিতে পাখি মারবার চেষ্টা করতে, বড় গাছে উঠে যেতে। দেখানোর মতো এইসব বীরত্বই সম্বল ছিল তোমার।

তারপর একদিন নিজেদের বাগানে খেলতে খেলতে মঞ্জু একদিন ফটকের কাছে ছুটে এসে ডাক দিল, রতু! এই রতু!

তুমি পালাচ্ছিলে ডাক শুনে। মঞ্জু ছাড়েনি তবু। ফটক খুলে পাথর-কুচির রাস্তায় কাঁচ পায়ের শব্দ তুলে দৌড়ে এসে হাত ধরল। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল মুখের দিকে, অবাক হয়ে।

এত ডাকছি, শুনতে পাওনি?

ডাকছিলে? ও, তাহলে শুনতে পাইনি।

ঠিক শুনেছো। দুষ্টু কোথাকার! ভারী ডাঁট তো তোমার।

তুমি কথা বলতেই পারোনি।

মঞ্জু হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তোমাকে, ওদের বাগানে। পরীর মতো মেয়েরা খেলছে ওদের বাগানে, গাছে চড়ছে, হাসছে, চেঁচাচ্ছে। চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি।

মঞ্জু দৌড়ে একটা পেয়ারা এনে তোমার আড়ষ্ট হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, খাও রতু।

খাবো?

তবে পেয়ারা দিয়ে কি করে লোকে? খায়ই তো!

কী যে সুগন্ধ মাখানো ছিল পেয়ারাটার গায়ে, আজও মনে আছে তোমার। হয়তো পাউডার বা স্নোয়ের গন্ধ, হয়তো তা মঞ্জুরই গন্ধ।

পেয়ারাটাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে!

ইস্কুলে চোরের মার খেতে তুমি রোজ। মার খেতে খালাসীপট্টিতে, মেছোবাজারে, বাবুপাড়ায়। দুষ্টু ছিলে, দাঙ্গাবাজ ছিলে, তাই মার খেতে খেতে দড় হলে। সবচেয়ে বেশী লেগেছিল একদিন। ইস্কুল থেকে ফেরার সময়ে

খালাসীপট্টিতে একটা লোক হঠাৎ অকারণে কোথা থেকে সুমুখে এসে তোমার পথ আটকাল।

তুমি পাশ কাটাতে চেষ্টা করছিলে।

লোকটা হঠাৎ বলল 'শুয়ারকা বাচ্চা', তারপর বিনা কারণে তোমার কান ধরে গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। সেই চড়টা আজও জমা আছে। কিছুতেই ভোলোনি। শোধ নেওয়া হয়নি। তুমি শোধ নিতে ভালবাস না কিন্তু আজও ভাবো, এই চড়টার শোধবোধ হওয়া দরকার। চড়টাকে কোন খাতে ধরবে মুখুজ্জে ?

বড় একটা শ্বাস ফেললে ? ফেল। তোমার অনেক নিশ্বাস জমা হয়ে আছে।

বেশ গুছিয়ে বসেছো। প্রথম যৌবনের ততটা টানাটানির সংসার আর নেই। দুবেলা দুটো ভালমন্দ খাও। ঘরে দু-চারটে দামী জিনিসপত্রও নেই কি ? আছে ছেলে, মেয়ে, বউ।

বউ সেই মঞ্জু নয়, বুলুও নয়। এ অন্য একজন, যাকে তুমি আজও চেনোনি।

বউ বলে, তুমি অপদার্থ, ভীতু। বদমাশ। কখনো বলে, তোমাকে ভালবাসি।

এইসব কথাগুলো হিসেবে ফেলে দেখ তো, কোনটা জমা, কোনটা খরচ।

পারছ না মুখুজ্জে, গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঐ যে একটি চিঠি এল তোমার নামে সেদিন। কী সুন্দর এক অচেনা মেয়ের চিঠি !

পড়ো মুখুজ্জে। লিখেছে : আপনার একটুখানি বেঁচে থাকা আমার কাছে অনেকখানি। প্রণাম করলাম।

কোন খাতে চিঠিটাকে ধরছ ? জমা ! হাসালে।

বড্ড জট পাকিয়ে যাচ্ছে হিসেব নিকেশ মুখুজ্জে। মেয়ে এসে গলা জড়িয়ে বলছে, বাবি, তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। অবোলা ছোট্ট ছেলেটা তোমাকে দেখলেই দুহাত তুলে ঝাঁপিয়ে আসে।

এগুলো জমার খাতে ধরবে না !

সুখ আর দুঃখগুলোকে আলাদা করে করে আঁটি বেঁধে রেখেছো, কিন্তু কোন খাতে যাবে তা ধরোনি। সব সুখই তো আর জমা নয়। সব দুঃখই যেমন নয় খরচ।

কাঁদছো মুখুজ্জে ! কাঁদো। এই মধ্য বা শেষ যৌবনে একটু আধটু কাঁদতেই হয় মানুষকে। হিসেবের সবে শুরু কিনা।

অনুভব

সামনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই হৃদয়ের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কাজ করল। কাগজটা মুখ থেকে সরিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে নিচের মাঝারি চওড়া রাস্তার দিকে চেয়ে সে দেখল তার ছেলে মনীশ, নাতি অঞ্জন আর পুত্রবধূ শিমুল আসছে। দৃশ্যটি এই শরতের মেঘভাঙা উজ্জ্বল সোনালী রোদে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে। মনীশের পরনে গাঢ় বাদামী রঙের চৌখুপীওলা ঝকঝকে পাতলুন, গায়ে হালকা গোলাপী জলছাপওলা হাওয়াই শার্ট। লম্বাটে গড়নের, ফর্সা ও মোটামুটি স্বাস্থ্যবান মনীশকে বেশ তাজা ও খুশী দেখাচ্ছে। রাতে নিশ্চয়ই খুব ভাল ঘুমিয়েছে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়নি এবং হাতে কিছু বাড়তি টাকা আছে। নাতির পরনে নীল চৌখুপী এবং ডোনাল্ড ডাকওলা বাবা সুট, শিমুলের শ্যামলা ছিপছিপে শরীরে আঁট হয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে একটা বিশুদ্ধ দক্ষিণী রেশমের কাঁচা হলুদ রঙের চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি।

দৃশ্যটা চমৎকার। মনীশের হাতে সন্দেশের বাক্স। শিমুলের কাঁধ থেকে ব্যাগ ঝুলছে। আজ রবিবার, ওরা সারাদিন থাকবে, সন্ধের পর বণ্ডেল রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে। মনীশ বাবাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে চেনা দিল। হৃদয়ও হাত তোলে। তারপর নিস্পৃহ হয়ে আবার ইজিচেয়ারে পিছনে হেলে বসে খবরের কাগজের দিকে তাকায়।

কিন্তু খবরের কাগজ পড়ে না হৃদয়। সে বসে তার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা ইনস্টিংক্ট-এর কথা ভাবতে থাকে। এই যে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ইশারা জেগে উঠল আর হৃদয় দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় তাকিয়ে দেখল সপরিবারে তার ছেলে আসছে, এ ব্যাপারটা তাকে বেশ খুশী করে। এমন নয় যে ছেলেকে দেখে তার আনন্দ হয়েছে। বরং এই এ রবিবারের আগন্তুক মনীশকে সে খুব একটা পছন্দ করে না। ওর বউ শিমুলকে আরো নয়। মনীশের বয়স এখন বছর পঁচিশেক হবে, হৃদয়ের ধারণা শিমুলের বয়স মনীশের চেয়ে অন্তত বছর দুই তিন বেশী। নাতি অঞ্জনকে এমনিতে খারাপ লাগে না হৃদয়ের, তবে তার বাপ মা তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত এবং সতর্ক যে হৃদয় তার সম্পর্কে খুব আগ্রহ বোধ করে না আজকাল। একটু

ক্যাডবেরী কি সন্দেশ হাতে দিলেও অঞ্জনের বাপ মা সমস্বরে 'ওয়ার্ম'স ওয়ার্ম'স' বলে আঁতকে ওঠে। আরে বাবা, কৃমি কোন্ বাচ্চার নেই? তা বলে কি বাচ্চারা মিষ্টি খাচ্ছে না? অন্য কেউ স্নান করালে নাকি ছেলের ঠাণ্ডা লাগে বলে শিমুলের ধারণা। এ বাড়িতে এসেই ছেলের জন্য শিমুল ফি রবিবার হাফ বয়েল্ড ডিম আর সব্জীর স্টু বানানোর বায়না ধরবে। অত যত্নের ছেলেকে ছুঁতে একটু ভয় করে হৃদয়ের। আর ভয় করলে ভালবাসা বা স্নেহটা কিছুতেই আসতে চায় না।

কিন্তু হৃদয় তার ছেলে এবং ছেলের পরিবারকে দেখে খুশী হোক বা না হোক, এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি বয়সে নিজের সূক্ষ্ম বোধশক্তি দেখে কিছু তৃপ্তি পেয়েছে। বলতে কি, এই ইনস্টিংক্ট যে তার আছে এ বিষয়ে বরাবর সে নিঃসন্দেহ ছিল। সেবার জামসেদপুর যাওয়ার সময় তার কামরায় টি টি একটা বিনা টিকিটের ছোকরাকে ধরেছিল। ছোকরা বার বার তার এ পকেট ও পকেট খুঁজে রাজ্যের কাগজপত্র, নোটবই, রুমাল খুঁজে খুঁজে হয়রান। বলছে—টিকিটটা ছিল তো! পকেটেই রেখেছিলুম! কেউ বিশ্বাস করছিল না অবশ্য। টি টি তাকে বাগনানে নামিয়ে জি আর পি-তে দিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। ছোকরা তখন হৃদয়ের দিকে চেয়ে সাদা মুখে বলেছিল—দাদা, ঝাড়গ্রামে স্টেশনের কাছেই আমার দোকান, আমার ভাড়াটা দিয়ে দিন, আমি ঝাড়গ্রামে নেমে ছুটে গিয়ে টাকা এনে দিয়ে দেবো আপনাকে। হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট তখনই বলেছিল যে, এ ছোকরা মিথ্যে বলছে না। চোখে মুখে সরল সত্য-বাদিতার ছাপ ছিল তার। টিকিটও হয়তো কেটেছিল। কিন্তু ইনস্টিংক্টকে উপেক্ষা করেছিল হৃদয়। ভেবেছিল, যদি আহাম্মকের মতো ঠকে যাই? পরে অবশ্য ছোকরা সেই কামরাতেই খুঁজে পেতে তার ঝাড়গ্রামের চেনা লোক বের করে ভাড়া মিটিয়ে দেয় এবং হৃদয়ের কাছে এসে এক গাল সরল হাসি হেসে বলে—দাদা, পেয়ে গেছি। শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ের। সে তো জানত, মুখ দেখেই তার সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে টের পেয়েছিল, ছোকরা মিছে কথা বলছিল না। তার সেটুকু উপকার সেদিন করতে পারলে আজ এই সুন্দর সকালের সোনালী রোদটুকুকে আর একটু বেশী উজ্জ্বল লাগত না কি তার কাছে।

ওরা দোতলায় উঠে এসেছে টের পাচ্ছিল হৃদয় তার বউ কাজল দরজা খুলে নানারকম অভ্যর্থনা ও আনন্দের শব্দ করছে। করবেই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মনীশই যা একটু আধটু আসে। আর সবাই দূরে। মেজো ছেলে অনীশ অ্যামেরিকায়, ছোটো ক্ষৌণীশ তার মেজদার পাঠানো টাকায় দেরাদুন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে। একমাত্র মেয়ে অর্পিতা বোম্বাইয়ে স্বামীর ঘর করে। এ বাসায় কাজল আর হৃদয়, হৃদয় আর কাজল। শুনতে বেশ। কিন্তু আসলে যৌবনের সেই প্রথমকাল থেকেই কোনোদিন কাজলের সঙ্গে বনল না

হৃদয়ের। ফুলশয্যার রাতেই কাজল প্রথম আলাপের সময় বলেছিল—আমি কিন্তু গানের ক্ষতি করতে পারব না তাতে সংসার ভেসে যায় যাক। তখনই হৃদয়ের ইনস্টিংক্‌ট বলেছিল—একথাটা এই রাতে না বললেও পারত কাজল বিয়েটা হয়তো সুখের হবে না।

হয়ওনি। কাজল গান ছাড়েনি। এখনো রেডিওতে মাঝে মাঝে গায়, দু-একটা গানের স্কুলে মাস্টারি করে। প্রাইভেটে শেখানো তো আছেই। কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার কথা শুনে যেমন মনে হয়েছিল এ মেয়ে বোধহয় লতা মঙ্গেশকর হবে তেমনটা কিছুই হয়নি। বরং অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে জীবনে কিছু জটও পাকিয়েছে কাজল। তাকে বিভিন্ন ফাংশানে চানস দিতে পারে বলে কিছু প্রভাবশালী লোকের খপ্পরে পড়ে নিজেকে নষ্ট করেছে। হৃদয় কানাঘুষো শুনেছে, কাজল নিজের পবিত্রতা বজায় রাখে না। এখানেও সেই ইনস্টিংক্‌ট ছোটো ছেলে ক্ষৌণীশকে কোনো দিনই নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারে না হৃদয়।

মনীশ বারান্দায় এসে পাশের টুলের ওপর হৃদয়ের অভ্যস্ত ব্র্যাণ্ডের এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বাক্স ভোটা দেশলাই রেখে বলে—কেমন আছো বাবা?

হৃদয় আজকাল কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু কথায় ভেসে যেতে ভারী ভয় হয় তার। সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে সাবধান করে দেয়, কথা বোলো না, বেশী কথা বললেই ওরা বিরক্ত হবে। ভাববে তুমি বুড়ো হয়েছো। তোমার ব্যক্তিত্ব নেই।

হৃদয় সতর্ক হয়। এত বেশী সতর্ক হয় যে মুখই খোলে না। ঘাড় নেড়ে জানায় ভাল।

অনীশ অ্যামেরিকা থেকে তার ডাক্তার দাদার জন্য খুবই আধুনিক ধরনের একটা ব্লাড প্রেশারের যন্ত্র পাঠিয়েছে। সেটা প্রতিবারই সঙ্গে আনে মনীশ। আজও এনেছে। টুলের ওপর রেখে হাত বাড়িয়ে বলল—হাতটা দাও, প্রেশারটা দেখি।

হৃদয় মাথা নাড়ে, না। খামোখা দেখ। হৃদয়ের প্রেশারের কোনো গণ্ডগোল নেই। তেমন কিছু বয়সও তো হয়নি তার। মোটে সাতচল্লিশ। একুশ বছর বয়সে সে বিয়ে করেছিল মায়ের বায়নায়। বাইশ বছর বয়সে মনীশ হয়। এখনো হৃদয়ের চেহারা ছিপছিপে, প'য়ত্রিশ ছত্রিশের বেশী দেখায় না। চুল এখনো বেশ কুচকুচে কালো, চলাফেরা যুবকের মতো চটপটে। বয়সের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। তবে যে মনীশ প্রায়ই তার প্রেশার দেখে সেটা একরকম তোষামোদ ছাড়া আর কিছুই নয়। বাপকে সে কোনো দিনই রোজগারের পয়সা দেয় না।

মনীশ চাপাচাপি করল না, তবে কৌতূহলভরে মুখের দিকে চেয়ে বলল—

তোমার মেজাজটা আজ খারাপ নাকি ?

বারান্দার ওদিকটায় নাতি কোলে করে কাজল এসে দাঁড়াল। 'ঐ দেখ, ঐ দেখ বলে রাস্তায় আঙুল দিয়ে কী একটু দেখিয়ে ফিরে চাইল হৃদয়ের দিকে। বেশ কোমল গলায় বলল—দেখাও না প্রেশারটা। দেখাতে দোষ কি ?

হৃদয় তার প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলে কোলের ওপর রেখে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে—কেন দেখাবো ?

এই স্বর চেনে কাজল। ভ্রূ কুঁচকে স্বামীর দিকে চায়। তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে—থাক থাক, দেখাতে হবে না।

মনীশ খুব চালাকের মতো বলে— বাবা, ডোণ্ট মাইণ্ড। জাস্ট চেক আপ করতে চেয়েছিলাম। জাস্ট চেক আপ, তাছাড়া কিছু নয়।

কাজল ধমকে দেয়—থাক তোকে দেখতে হবে না। যে চায় না তারটা দেখবি কেন ?

হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট বলল, আজকের দিনটা ভাল যাবে না। হয় দুপুরে, নয়তো রাত্রে একটা তুমুল ঝগড়া লাগবে কাজলের সঙ্গে। লাগবেই।

কাজল নাতিকে নিয়ে এবং মনীশ তার যন্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। হৃদয় বসে থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলায়। জনতা গভর্ণমেণ্ট হয়তো বেশী দিন টিকবে না। ইন্দিরাও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। তাহলে নাইনটিন এইট্টিতে ভারতবর্ষ শাসন করবে কে ? ভূতে ?

যে যুবতী মেয়েটি তাদের রান্না করে সে এসে টুলের ওপর এক কাপ চা রাখল। মেয়েটির দিকে কোনোদিনই খুব ভাল করে তাকায় না হৃদয়। তাকাতে ভরসা হয় না। মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ কি সাতাশ হবে। স্বামী নেয় না বলে কসবায় বাপের বাড়িতে থেকে কাজ করে খায়। এ বাড়িতে দুবেলা রাঁধে, সারা দিন নানা কাজ করে, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে যায়। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। রাঁধে অবশ্য খুবই ভাল। ইংলিশ ডিনার থেকে মাদ্রাজী ইডলি দোসা সবরকম খাবার করতে পারে। কিন্তু সেটা কোনো যোগ্যতা নয়। আসল যোগ্যতা হল, ওর বয়স। চমৎকার বয়স। চেহারাখানা রোগাটে হলেও খাঁজকাটা শরীরের একটা লাবণ্য আছে। মুখখানা মোটামুটি। আগে উলোঝুলো ঝিয়ের মতো আসত। এখন সাজে। পারিপাটি করে বাঁধা চুল, চুলে লাল নীল ফিতে, কপালে টিপ। হৃদয়ের সামনে আসবার আগে মুখখানা যে আঁচল দিয়ে ভাল করে মুছে আসে তা হৃদয় ইনস্টিংক্ট দিয়ে টের পায়।

আজও পেল। খবরের কাগজের ডানদিকের পাতায় কোনাচে একটা খুনের খবরে চোখ রেখেও হৃদয় বুঝতে পারে ললিতা তার দিকে খুব নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু চাপা গলায়, যেন গোপন কথা বলার মতো করে বলল— আপনার চা।

গভীর শ্বাস ছেড়ে হৃদয় বলে—হুঁ।

লক্ষ্য করেছে হৃদয়, বয়সে যথেষ্ট ছোটো হলেও ললিতা তার বউকে বৌদি আর তাকে দাদা বলেই ডাকে। আবার মনীশ আর তার বউকে বলে বড়দা আর বড়বৌদি। কাজল বলে বলেও তাকে আর হৃদয়কে মাসী মেসোর গোছের কিছু ডাকাতে পারে নি ললিতাকে দিয়ে। এ সবই একরকম ভাল লাগে হৃদয়ের। একটা গোপন অবৈধ তীব্র অনুভূতি। ললিতা তাকে মেসো বলে ডাকলে হয়তো এই অনুভূতিটা হত না তার।

কাজল গানের স্কুল বা টিউশনিতে যায়। ছুটির দিনে ফাঁকা বাড়িতে কত দিন একাই থাকে হৃদয় আর ললিতা। কোনোদিন হৃদয় সচেষ্ট হয়নি। ললিতাও না। তবে দুজনকে ঘিরে একটা তীব্র অনুভূতির বৃত্ত যে বরাবর তৈরি হয়েছে এটা ইনস্টিংক্ট দিয়ে কতবার টের পেয়েছে হৃদয়। কিন্তু বাইরে ভালোমানুষ এবং ভিতরে এক শয়তান হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া সে আর কীই বা করতে পারে?

হৃদয়ের আর কিছুই বলার ছিল না। ললিতা চলে গেল। কিন্তু হৃদয়ের কেমন যেন মনে হয়, ললিতা আর তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু হৃদয়ের যে বলার মতো কথা নেই। জীবনে অন্তত একবার খারাপ হওয়ার বড় ইচ্ছে তার। কিন্তু কিছুতেই একটা মানসিক ব্যারিকেড ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

এই ব্যারিকেড অনায়াসে ভেঙেছে কাজল। যতই বুঝতে পেরেছে যে, স্বাভাবিক পথে গানের জগতে সে ওপরে উঠতে পারবে না, ততই সে অলি গলি রুদ্ধপথের সন্ধানে নিজেকে সস্তা করেছে। হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বিষিয়ে যায়। তাই হৃদয় একসঙ্গে থেকেও কাজলকে বিশেষ নজরে রাখেনি। কিন্তু টের পেয়েছে ঠিকই। তার ইনস্টিংক্ট কম্পাসের কাঁটার মতো নির্দেশ করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে সন্ধেয় হৃদয় এমনি বারান্দায় বসে ঝুঁকে রাস্তা দেখছিল। তার দুপাশে কিশোর মনীশ আর কিশোরী অর্পিতা। হঠাৎ রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে কাজলকে ফিরতে দেখল। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই সন্ধে পার করে কাজল বাসায় ফেরে। তবু সেদিন নতমুখী, অন্যমনা কাজলের হেঁটে আসার ভঙ্গীর মধ্যে কী দেখে তার ইনস্টিংক্ট নিঃশব্দে চেঁচিয়ে উঠল—অস্পৃশ্য! অস্পৃশ্য! তখন মনীশ আর অর্পিতা ভারী খুশীর গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা! কিন্তু কাজল ওপরের দিকে তাকায়নি। খুব অন্যমনস্ক ছিল।

সেই রাত্রেই শোওয়ার ঘরে হৃদয়ের জেরার কাছে প্রায় ধরা পড়ে কাজল। কিন্তু স্বীকার করল না কিছু, উল্টে কত ঝগড়া করল। কিন্তু তাতে হৃদয়ের অনুভূতি বদলে গেল না।

এতদিন বাদে এই সুন্দর শরতের ভোরে সেই সব পুরোনো কথা মনটা ভারী এলোমেলো করে দিল। বাতাসে কোল থেকে উড়ে গড়িয়ে পড়ল খবরের কাগজের আলগা পাতা। গত তিন চার বছর ধরে একটানা কাজলের সঙ্গে তার সম্পর্ক-

হীনতা চলছে।

হৃদয় উঠল। কারো সঙ্গে কথা বলল না পায়জামার ওপর একটা পাঞ্জাবি চাড়িয়ে, মানিব্যাগটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বেরোবার মুখে শুনতে পেল তিনটে শোওয়ার ঘরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভাল সেই পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরে মনীশ আর কাজল কথা বলছে। অঞ্জনকে ভিতরের ডাইনিং স্পেসে খাওয়াতে বসিয়েছে শিমুল। শিমুলকে ভাল করে চেনেও না সে। একদিন মনীশ ওকে রেজিস্ট্রী বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল প্রণাম করাতে। সেই প্রথম দেখা। সামাজিক মতে একটু বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল পরে। তারপর থেকে ওরা আলাদা। শিমুল শ্বশুরকে দেখে নড়ল না, একটু ভদ্রতার হাসি হেসে বলল—ভাল তো?

হৃদয় ভ্রু কোঁচকায়। এরা কারা, কোথেকে এল তা যেন ঠাহর পায় না। এত অনাত্মীয় এরা যে কথার জবাব পর্যন্ত দিতে ইচ্ছে করে না তার। দিলও না হৃদয়। ভিতরের বারান্দায় এসে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ানোর সময় একবার অভ্যাসবশে রান্নাঘরের দিকে এক ঝলক তাকাল সে। ললিতা প্রেশার কুকারের স্টিম ছাড়ছে। ধোঁয়াটে বাষ্পের মধ্যে আবছা দেখায় তাকে। তবু দুখানা চোখের কৌতূহল ভরা দৃষ্টি স্পর্শ করে হৃদয়কে। কাউকে কিছু বলে আসেনি হৃদয়। কিন্তু কে জানে কেন ললিতার দিকে চেয়ে বলল—আমি একটু বেরোচ্ছি।

ললিতা তাড়াতাড়ি প্রেশার কুকার রেখে উঠে আসে। মুখে ঘেমো ভাব, চুল কিছু এলোমেলো, অকপটে চেয়ে থেকে বলল—ফিরতে কি দেরি হবে?

—হতে পারে?

ললিতা কিছু বলল না। কিন্তু সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, যতক্ষণ হৃদয় না চোখের আড়ালে গেল।

পুরোনো আড্ডা সবই ভেঙে গেছে। বাইরের পৃথিবীটা এখন আর আগেকার মতো নেই। বড্ড পর হয়ে গেছে সব। এখন হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল তার দোতলার ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দাটুকু। এ গ্রেড ফার্মে সবচেয়ে উঁচু থাকের কেরানী হিসেবে তাকে অফিসে অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। সেটুকু সময় বাদ দিয়ে বাকি দিনটুকু সে বসে থাকে বারান্দায়। বেশ লাগে। অনেক মাইনে পায় হৃদয়। ওভারটাইম নিয়ে হাজার দুই আড়াই কি কখনো তারও বেশী। পুজোর মাসে দেদার বোনাস পেয়েছে। সবটা তার খরচ হয় না। কাজলেরও আয় খারাপ নয়। দুজনের বনিবনা নেই বলে কাজল তার কাছে বড় একটা বায়না বা আবদার করে না। তাই হাতে বেশ টাকা থাকে হৃদয়ের। কিন্তু সেই টাকা খরচ করার পথ পায় না সে। কী করবে? মদ খেতে রুচি হয় না। জামা কাপড়ের শখ নেই। জিনিস কেনার নেশা নেই। কী করবে তবে?

বুক পকেটে মানিব্যাগটা টাকার চাপে ফুলে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। ভারী লাগছে। ব্যাগে কত টাকা আছে তার হিসেব নেই হৃদয়ের। কয়েক শো হবে। হাজার খানেকের কাছাকাছিও হতে পারে।

চওড়া গলি পার হয়ে কালীঘাটের উল্টোদিকে রসা রোডে এসে দাঁড়ায় হৃদয়। লক্ষ লক্ষ লোক ছুটি আর রোদে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা ভেবে পাওয়া শক্ত। মোটামুটি সকলেরই কোনো না কোনো গন্তব্য রয়েছে যা হৃদয়ের নেই। চারদিকে এত অচেনা মানুষের মধ্যে আজকাল বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে সে। কেন যেন তার ইনস্টিংক্ট তাকে সব সময়ে সাবধান করে দেয়, চারদিক সম্পর্কে সজাগ থেকো। এরা বেশীর ভাগই খুনে, বদমাশ, চোর পকেটমার দাঙ্গাবাজ ঝগড়ুটে। তোমাকে একটু বেচাল দেখলেই পকেট ফাঁক করবে, ঝগড়া বাধাবে, অপমান করবে, মেরে বসবে বা মেরেই ফেলবে।

ফাঁকা অলস গতির ট্যাক্সি ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে কিছু না ভেবেই হাত তোলে হৃদয় এবং উঠে পড়ে। আজকাল তার বাইরে সম্পর্কে ভীতি জন্মেছে আগে যা ছিল না। সে সবচেয়ে নিরাপদ বোধ করে নিজের সামনের বারান্দায়। যদি তার কোনো গন্তব্য থাকে তবে তা ঐ ভাড়াটে বাড়ির বারান্দাটুকুই। বাদবাকি শহর, দেশ বা রাষ্ট্র তার কাছে এক দূরের অচেনা রাজ্য। ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছে, পিছু হেলে বসে হৃদয় নিস্তেজ চোখে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। তার সুখদুঃখের বোধ ডুবে গেছে একেবারে। কী সুখ কী দুঃখ বলতে পারে না। এত অনাত্মীয় হয়ে গেছে তার আত্মীয়স্বজন যে তার ভয় হয়, এদের মধ্যে কেউ মরে গেলে সে তেমন কোনো শোক করবে না। ভেবে মাঝে মাঝে সে একটু অবাক হয়। নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করে, যদি এখন মনীশ বা অনীশের কিছু হয় তবে তোমার রিঅ্যাকশন কেমন হবে? যদি কাজলের কিছু হয়, তাহলে? ইনস্টিংক্ট তাকে বলে, কিছু হলে তোমাকে বাপু জোর করে থিয়েটারী কান্না কাঁদতে হবে।

কামুর আউটসাইডার বইখানা পড়েছে হৃদয়, অ্যালিয়েশনের কথাও তার অজানা নয়। সে কি ঐসবেরই শিকার? হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—না হে, তা নয়। আসলে তোমার সন্নিসী হওয়ারই কথা ছিল যে! তা হতে পারোনি বলে তোমার মনটা তোমাকে ফেলে জঙ্গলে চলে গেল। এখন তুমি আর তোমার মন ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

মানিব্যাগটা বুকে বড্ড চাপ দিচ্ছে। দম চেপে ধরছে। অস্ফুট একটু শব্দ করে হৃদয়। ট্যাক্সিওলা বাঙালী ছোকরাটি একবার ফিরে চায়। বলে—কিছু বলছেন?

হৃদয় মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, সে কিছু বলছে, বহুদিন আমাকে বড় অনাদর করেছো তোমরা। ঠিকমতো লক্ষ্য করোনি আমার রক্তচাপ, হৃদ্‌যন্ত্র বা ফুসফুস ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। জানতে চাওনি কতখানি রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আমার হৃদয়।

হৃদয় মানিব্যাগটাকে পকেটসুদ্ধ খামচে ধরে বুক থেকে আলগা করে রাখে। তারপর ট্যাক্সির মুখ ঘোরাতে বলে। কোথাও যাওয়ার নেই শুধু ঐ নিয়তি

নির্দিষ্ট বারান্দাটা ছাড়া।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল হৃদয়ের। কেন এই বাড়ি ছাড়া তার আর কোনো গন্তব্য থাকবে না? কেন আর কোথাও তার যাওয়ার নেই? কেন এত কম মানুষকে চেনে সে?

মানিব্যাগটা আলগা করে ধরে রেখেও বুকের বাঁ ধারের অস্বস্তিটা গেল না। দমচাপা একটা ভাব। রসা রোডে নিজের গলির মোড়ে ট্যাকসিটা ঠিক যেখানে ধরে ছিল সেখানেই আবার ছেড়ে দিল সে। কী অর্থহীন এই যাওয়া আর ফিরে আসা!

বেলার রোদ খাড়া হয়ে পড়ছে। জ্বলে যাচ্ছে শরীর, ঝলসে যাচ্ছে চোখ। হৃদয় ধীর পায়ে হেঁটে গলিতে ঢুকল। আস্তে আস্তে দোতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। ওপরে খুব হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। এবার পুজোয় কাজলের একটা আধুনিক গানের এক্সটেণ্ডেডপ্লে রেকর্ড বেরিয়েছে। স্টিরিওতে সেই রেকর্ডটা বাজছে এখন। বহুবার শোনা হৃদয়ের। কেউ বাড়িতে এলেই বাজানো হয়। জঘন্য গান। প্রায় অশ্লীল দেহ ইঙ্গিতে ভরা ভালোবাসার কথা আর তার সঙ্গে ঝিন-চাক মিউজিক।

দোতলার বারান্দায় উঠতে খুবই কষ্ট হল হৃদয়ের। মানিব্যাগটা বের করে ঝুল পকেটে রেখেছে. তাও বাঁ দিকের বুকে চাপটা যায়নি। এখন সেই চাপ-ভাবের সঙ্গে সামান্য পিন ফোটানোর ব্যথাও। সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিচ্ছিল হৃদয়। বুঝতে পারছে তার মুখ সাদা, গায়ে কলকল করে ঘাম নামছে।

ললিতা ডাইনিং হলের পর্দা সরিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখে থমকে দাঁড়ায়। দু'পা এগিয়ে এসে বলে—কী হয়েছে?

হৃদয় কখনো এ মেয়েটার চোখে চোখ রাখতে পারে না। মনে পাপ। চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব অভিমানের গলায় বলে—কিছু না!

এ অভিমানের দাম দেয় কে? হৃদয় হাঁফ ধরা বুক হাতে চেপে ঘরের দিকে এগোয়। বুঝতে পারে, শব্দগুলো আবছা হয়ে আসছে চোখে, বুকে ফুরিয়ে আসছে বাতাস। স্ট্রোক কি?

ভাবতেই মনটা অদ্ভুত ফুরফুরে হয়ে গেল আনন্দে। দীর্ঘকাল সামনের বারান্দায় বসে সে কি এই স্ট্রোকেরই অপেক্ষা করেনি? ইনস্টিংক্ট বলত—আসবে হে আসবে একদিন। সে এসে সব যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে।

কার কথা বলত তার ইনস্টিংক্ট তা তখন বুঝতে পারত না সে। আজ মনে হল, এই অদ্ভুত অসুখের কথাই বলত।

হৃদয় ভেবেছিল, খুব নাটকীয়ভাবে সে ঘরের দরজায় লাট খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না। হাত পা কাঁপছিল থরথর করে, বুকে অসম্ভব ধড়ধড়ানী আর হুলের ব্যথা, গায়ে ফোয়ারার মতো ঘাম। তবু পড়ল না। চেতনা রয়েছে এখনো, খাড়া থাকতে পারছে। পর্দাটা সরিয়ে ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে ঢুকল সে।

দরজার মুখে ললিতা এসে পিছন থেকে দুটো কাঁধ ধরে বলে—শরীরটা তো আপনার ভাল নেই। বৌদিকে ডাকবো?

বিরক্তির গলায় হৃদয় বলে—না, কাউকে ডাকতে হবে না।

ললিতা বোকা নয়। সব জানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই মৃদু স্বরে বলে—আচ্ছা চলুন আমি বারান্দায় পৌঁছে দিই আপনাকে!

খুব যত্নে ইজিচেয়ারে তাকে স্থাপন করে ললিতা। টুল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে সেটা সামনে রেখে পা দুটো টান করে মেলে দেয় টুলের ওপর। মৃদুস্বরে বলে—চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন।

মুখে বড় ঘাম জমেছিল হৃদয়ের। ললিতা কিছু খুঁজে না পেয়ে তাড়াতাড়িতে নিজের শাড়ির আঁচলে যত্নে ঘামটুকু মুছে দিল। বলল—পাখা আনছি। চোখ বুজে ঘুমোন তো।

আলো মুছে যাচ্ছিল, ক্লান্তিতে এক অতল খাদে গড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু চোখ খুলে চেয়ে থাকে হৃদয়। হাঁ করে চেয়ে থাকে ললিতার দিকে। একটুও কাম বোধ করে না সে। সব ভুলে হঠাৎ 'মা' বলে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে।

ঝিনচাক মিউজিকের সঙ্গে কটু সুরের গান বেজে যাচ্ছে স্টিরিওতে, সঙ্গে বাচ্চা বুড়োর গলায় হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ। কিন্তু এই সামনের বারান্দায় এই শরৎকালের উজ্জ্বল দুপুরে ভারী পুরোনো দিনের এক আলো এসে পড়ল। হৃদয়ের ইনস্টিংক্ট বলল, মরবে না এ যাত্রায়।

সুখের দিন

মহারাজ, আমাদের সেই সব সুখের দিন কোথায় গেল ?

তখন আকাশে কাঠচাঁপা ফুলের মতো চাঁদ উঠত। জ্যোৎস্নারাতে ছিল আমাদের নদীর ধারে সাদা বালির ওপর চড়ুইভাতি। আকাশ তখন কত নিচুতে নেমে আসত ! ঝাড়বাতির মতো থোপা থোপা হয়ে আলো দিত গ্রহ নক্ষত্র।

সে কি তুমি মহারাজ, যে রোজ আমাদের ঘুম ভাঙার আগে খুব ভোরে হরেক রকম রঙের বালতি হাতে ঘুরে ঘুরে রং করে দিয়ে যেতে গাছপালা, মাঠ নদী আর আকাশ ? সে কি তুমি মহারাজ যে প্রতিদিন আমাদের অন্ন আর জল আরো সুস্বাদে ভরে দিয়ে যেতে ?

ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন টের পেতুম, তুমি এসেছিলে। প্রতিদিন দুহাত ভরে পেতুম নতুন একখানা জগৎ। তখন রোজ ছিল আমাদের জন্মদিন।

কড়াইশুঁটি ছাড়াতে বসলেই ঠাকুরমার মনে পড়ত গত জন্মের কথা। কে না জানে কড়াইশুঁটির খোলের মধ্যেই থাকে আমাদের সব পূর্বজন্মের কাহিনী। সবুজ মুক্তোদানার মতো সেই কড়াইশুঁটি ভরে থাকত গল্পে গল্পে। কাচের বাটি উপচে পড়ত মুক্তোদানায়। কী সুন্দর যে দেখাত। কী বলব তোমাকে তার চেয়েও সুন্দর ছিল আমাদের কোল কুঁজো ঠাকুমার ভাঙাচোরা মুখখানা। সত্য সত্য, তিন সত্য মহারাজ, তখন কারো মরণ ছিল না। যে জন্মাত পৃথিবীতে তারই ছিল অমরত্বের বর।

কোথায় গেল সেইসব সুখের দিন ?

তখন ফুলের ছিল ফুটবার নেশা, ফলের ছিল ফলবার আকুলতা। আমাদের বাগান তাই ছিল ভরভরন্ত। ফল ফুল উপচে পড়ত বেড়া ডিঙিয়ে। সারাদিন পতঙ্গের শব্দ হত বাগানে, পাখি ডাকত। পিপুল গাছের তলায় ছিল মস্ত এক পাথরের আসন। সেইখানে মাঝে মাঝে জন্মান্তর থেকে মানুষেরা আসতেন।

একদিন ভোরবেলা আমাদের সাদা খরগোশ গিয়েছিল বাগানে, ফিরল সবুজ হয়ে। আমরা দৌড়ে বাগানে গিয়ে দেখি পাথরের আসনে বসে আছেন আমাদের প্রবৃদ্ধ এক প্রপিতামহ। পৃথিবীর ধুলোখেলা শেষ করে তিনি চলে গেছেন কবে ! আমাদের দেখে বড় মায়াভরে চেয়ে রইলেন, বললেন—কিছু চাইবে ?

তখন কী-ই বা চাওয়ার ছিল মহারাজ? তখন প্রতিদিন আমাদের ছোটো পাত্র উপচে পড়ে আনন্দে। আর কী চাইব? আমরা বললুম—আমাদের সব কিছু নতুন রঙে রঙীন করে দাও। মস্ত সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন—যত গতি বেশী, সাদা সেখানে বেশী, যেখানে যত গতির অভাব সেখানে তত রং, এমনি করে সেভেন কলারস। দ্যাখ ভাই, মন যত উচ্চস্তরে ওঠে, তত সব জ্যোতির্ময় দেখা যায়। গাছটা দেখলে সেও আলোর গাছ। যত মন স্থূলে শরীরের দিকে থাকে, তত স্থূল হয়, তত কুচুটে হয়। মন যত বস্তু ভাবে তত কম্পন কমে যায়।

ভারী শক্ত কথা, তবু আমরা একটু একটু বুঝলুম। পাথরের আসন ঘিরে ঝুপ ঝুপ করে বসে পড়ে বললুম—তবে গল্প বলো।

তেমন গল্প আর কখনো শুনিনি আমরা। সে হল আকাশ নদীর গল্প। সে নদী সমুদ্রের মতো বিশাল; তার প্রবাহ অন্তহীন। তা আকাশের এক অনন্ত থেকে আর এক অনন্তের দিকে চলে গেছে। সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বলেন—একদিন দেখতে পাবে সেই উজ্জ্বল নদী। খুব কাছে, তবু অত সহজ নয় তার কাছে যাওয়া।

মহারাজ আমাদের ঘরের কাছেই ছিল পৃথিবীর ছোটো নদী। তার তীরে সাদা ধপধপে বালিয়াড়ি। ছিল বালিয়াড়িতে জ্যোৎস্না রাতের চড়ুইভাতি। নদী কেমন তা আমরা জানি। তবু সেদিন আকাশ নদীর গল্প শুনে আমাদের জীবনে অল্প একটু দুঃখ এল।

আমাদের সাদা খরগোশ হয়ে গিয়েছিল সবুজ। আমরা রং বড় ভালবাসতুম। সেদিন বুঝলুম রংই সব নয়। আসল হচ্ছে কম্পন, আসল হল গতি। সুখের চেয়ে অনেক বড় হল জ্ঞান।

কে আমাদের পোষা ময়নাকে শিখিয়েছিল—বেলা যায়! বেলা যায়! ময়না দিন রাত আমাদের ডাকত—ওঠো, ওঠো ভোর হল। বেলা যায়। বলতে বলতে দাঁড় বেয়ে সে সার্কাসের খেলুড়ীর মতো ঘুরপাক খেত, হেঁটমুণ্ডু হয়ে ঝুলত। মুক্তি চাইত কি মহারাজ?

আমরা বিশ্বাস করতুম, আমাদের মৃত্যু নেই, জরা নেই, আমাদের বেলা কখনো যায় না। একভাবে বা অন্যভাবে সবাই চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকে।

তখন কী পুরু সর পড়ত দুধে! পোলের ওপর দিয়ে নূপুর বাজিয়ে যেত বহু দূরগামী রেলগাড়ি। কাঁথায় ছিল আশ্চর্য ওম। বৃষ্টি থামলেই রামধনু উঠত! তখন ন্যাংটো হতে আমাদের কোনো লজ্জা ছিল না।

কোথায় গেল সেই সব সুখের দিন মহারাজ?

আমাদের পথে কোনো দোকান ছিল না, আমরা কখনো ফেরিওয়ালাও দেখিনি। কীভাবে কেনাকাটা করতে হয় তা শেখায়নি কেউ। পয়সা কোন কাজে লাগে কে-ই বা ভেবেছিল তখন?

পাঠশালার পাশেই ছিল হরিণের চারণভূমি। রোজকার ঘাস খেয়ে বনের হরিণরা ফিরে যেত বনে। সে কি তুমি মহারাজ, রোজ রাতে এসে গোপনে যে মাঠের ফুরোনো ঘাস আবার পূরণ করে দিয়ে যেতে? রোজ বেলা শেষে দেখতুম, ন্যাড়া মাঠে ঘাসের গোড়াগুলো ছাঁটা চুলের মতো হয়ে গেছে হরিণের দাঁতে। পরদিন পাঠশালায় আসবার পথে দেখি, কচি দূর্বাঘাসে দুধেল হয়ে আছে মাঠ। তুমি করতে মহারাজ? না কি তখনকার মাটিই ছিল ওইরকম উর্বর?

বুনো হরিণদের কখনো ভয় পেতে দেখিনি। কিন্তু একদিন এল ফাঁদ নিয়ে বাইরের মানুষ। মুহূর্তে কী করে টের পেয়ে পাল পাল হরিণ মায়ামৃগের মতো মিলিয়ে গেল।

হরিণ ধরুয়াদের ধৈর্য বটে। দিনের পর দিন তারা সেইসব মায়াহরিণ ধরতে আসে, ফাঁদ পাতে। রোজ শূন্যহাতে ফিরে যায়। তারপর একদিন তারা আমাদের বলল—ধরে দাও। হরিণ প্রতি এক মোহর।

মহারাজ, আমাদের সেই প্রথম পাপ। আমরা প্রত্যেকেই পেয়েছিলাম একটা দুটো করে মোহর। আর সেই রাতে কে বলো তো মহারাজ, আকাশকে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওই অত উঁচুতে? আর তো কই কাঠচাঁপার মতো দেখাল না চাঁদকে! হাতের নাগালে ছিল ঝাড় বাতির মতো নক্ষত্ররা। তারা সেদিন থেকে হয়ে গেল ভিনদেশের দেওয়ালীর আলো না কি জোনাকি পোকা। সেই রাতেই দেখলুম, চাঁদের বুক জুড়ে বসে আছে একটা পেটমোটা মাকড়সা। বহু দূর পর্যন্ত ছড়ানো তার জাল।

মোহর পকেটে নিয়ে পরদিন পাঠশালায় গিয়ে দেখি, এক বাদামওয়ালা ফটকের ধারে বসে আছে। পরদিন এল চিনির মঠ আর বুড়ির মাথার পাকাচুল বেচতে আরো দুজন। আমাদের পথে পথে দোকানের সারি গজিয়ে উঠল। মোহর খরচ হয়ে গেল। পকেটে এল আরো মোহরের লোভ।

সুখের দিন কি গেল মহারাজ? না কি তখনো নয়?

তখনো ভোরবেলা তুমি ঠিক রং দিয়ে যেতে চারধারে। প্রতিদিন আমাদের জন্মদিন ছিল। তুমি ভরে দিতে অন্নজলে সুস্বাদ। তখনো ন্যাংটো হতে লজ্জা ছিল না।

কবে যেন একদিন আমাদের সঙ্গী খেলুড়ী এক মেয়ে নদী থেকে উঠে এল স্নান সেরে। ক্ষমা করো মহারাজ, বিদ্যুৎ খেলেছিল দেহে।

সুখের দিনে তুমি কেড়ে নাওনি কিছু। সব ভরে দিতে। প্রতিদিন ছিল তোমার অক্লান্ত ক্ষতিপূরণ। কিন্তু সেই থেকে নিলে।

নদীর ধারে ছিল কাশবন, সাদা মেঘ, নীলাকাশ। ঋতু আসে যায়। ছবির পর ছবি আঁকা হয়। একদিন শরীর ভরে মেঘ করল, বাজ ডাকল মুহুর্মুহুঃ। কাশবনে কিশোরীর চুম্বনের স্বাদ বিষের বাটির মতো তুমিই কি এগিয়ে দাওনি মহারাজ? দিয়েছিলে। আর সেই সঙ্গে কেড়ে নিলে আমার অন্নজলের সেই

অফুরান স্বাদ আর ঘ্রাণ। মহারাজ ভোরবেলা চারধার রং করতে রোজ ভুলে· যেতে তুমি। উঠে দেখতুম নতুন রোদে পুরোনো পৃথিবীই আলো হয়ে আছে। কেন ন্যাংটো হতে লজ্জা এল? কেন আর দূরগামী ট্রেন রেলপোলে নূপুরের মতো বাজত না মহারাজ?

একদিন তাই আমরা শীতের শীর্ণ নদী হেঁটে পেরিয়ে গেলুম! বনের ভিতর দিয়ে শান্ত পথ গেছে এঁকে বেঁকে বহু দূরে। আমরা চলতে লাগলুম।

স্বচ্ছ সরোবর, উপবন, তারপর তোমার রাজবাড়ি। দেউড়িতে কেউ পথ আটকাল না, যেতে দিল। সাতমহলা বাড়ির ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাই। বিস্ময়ভরে দেখি. তোমার ঐশ্বর্য থরে বিথরে সাজানো। ছোটো একটা বাগানে তুমি হাঁটু গেড়ে আদর করছিলে হরিণকে। তোমাকে ঘিরে কত গাছপালা। কত পাখির ডাক কত পতঙ্গের ওড়াউড়ি।

আমাদের দিকে তাকিয়ে তুমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে এলে। ভৃঙ্গারের জলে হাত ধুতে ধুতে তুমি বলেছিলে—এরকমই হয়।

সুখের দিন ছিল মহারাজ। কোথায় গেল?

তুমি বড় স্নেহে কাছে এলে। প্রত্যেকের চোখে তুমি রেখেছিলে তোমার গভীর দুখানি চোখ। প্রত্যেকের প্রতি আলাদা ভালবাসা তোমার। বিমুগ্ধ চোখে দেখি তোমাকে। দেখা ফুরায় না। বাক্যহারা আমরা।

তুমি মাথা নুইয়ে বললে—আমার কিছু করার ছিল না।

আমরা বললুম, ফিরিয়ে দাও।

তোমার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল। দু চোখে মৃদু পিদিমের মতো স্নিগ্ধ আলো। তুমি বললে, চারণের মাঠে হরিণেরা ফিরবে না। অত সুন্দর আর রইল না জ্যোৎস্না। মাটির উর্বরতা কিছু কমে যাবে। তবু জেনো, আমি আগে তোমাদেরই আছি।

আমরা বললুম, ফিরিয়ে দাও।

তুমি মাথা নাড়লে। হাত তুলে মৃদু মুদ্রার একটি ইঙ্গিতে মিলিয়ে গেলে তুমি। মিলিয়ে গেল সেই প্রাসাদ, উপবন, সরোবর।

সেই থেকে সুখের দিন গেল মহারাজ। এখন তোমার সঙ্গে আমাদের এক আকাশনদীর তফাত।

মহারাজ, আমাদের সেই সব সুখের দিন কোথায় গেল?

লিফটের দরজার কাছে এক বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একা। লিফটের দরজা খোলাই রয়েছে। ওপরে যাওয়ার যাত্রী আজকাল আর নেই। কিন্তু সীমন্তককে যেতেই হবে। ওপরেই তার কাজ।

আজ সকাল থেকে সীমন্তক খুশীই রয়েছে। খুশী হওয়া খুব বিচিত্র নয়। কারণ আজ সকালের রেশনেই সে পেয়েছে আধঝুড়ি পালং শাক আর দু-মুঠো কড়াইশুঁটি। কি সবুজ! কী সবুজ! কৃত্রিম খাবার আর ভিটামিন আর ধাতব ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে জিভ অসাড়। বহুকাল পরে সে আজ সবজে টাটকা তরকারী খেল। কড়াইশুঁটির খোসাগুলোও সে ফেলে দেয়নি. পালং শাকের শেকড়টুকুও।

খোশমেজাজে লিফটে উঠবার মুখে সে বৃদ্ধের করুণ চাউনি দেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল—ওপরে যাবেন নাকি?

—নেবেন?

সীমন্তক মাথা নাড়ল—আসুন।

বুড়োকে চেনে সীমন্তক। প্রায়ই এখানে সেখানে দেখা হয়। বয়স বোধ হয় দুশো পচাত্তর বছর। আসলে এইসব বুড়ো মানুষেরা হল প্রদর্শনীর বস্তু। মানুষের বিজ্ঞান কত দূর কী করতে পারে এ হচ্ছে তারই এক উদাহরণ। যে ক'জন এরকম প্রবৃদ্ধ রয়েছেন। তাঁদের বেশীর ভাগেরই অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির অনেক অদল-বদল ঘটে গেছে। কারো বুকে অন্যের হৃদ্‌যন্ত্র কারো ফুসফুস কৃত্রিম, কারো পাকস্থলী কেটে বাদ দিয়ে কৃত্রিম পাকযন্ত্র বসানো হয়েছে, কারো ট্রানসপ্লান্ট হয়েছে মস্তিষ্ক। আর এইভাবেই এঁদের বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। তবে বেশীর ভাগেরই স্মৃতি ধূসর, বোধ বা বুদ্ধি খুবই ক্ষীণ, আচরণ অনির্দিষ্ট। সীমন্তক এঁদের এড়িয়েই চলে। কিন্তু আজ সে বড় খোশমেজাজে আছে, তাই বৃদ্ধকে উপেক্ষা করল না!

বুড়ো লোকটি লিফটে উঠে চারদিকে সভয়ে চেয়ে দেখছেন। মস্ত এক ঘরের মতো এই লিফটে নানা রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগানো। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই লিফট চালানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সীমন্তক বিশেষজ্ঞ। সে নানারকম চাবি টিপে, হাতল ঘুরিয়ে লিফট চালু

করে এবং গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। এক সময়ে আনমনে বলে ওপরে তো বরফ ছাড়া আর কিছু নেই, তবু কী দেখতে যান বলুন তো!

বৃদ্ধ খুবই কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—কিছু না। মাটির নিচে থাকতে ভাল লাগে না তো, তাই।

—মাটির নিচটা কি খারাপ?

—আকাশ দেখা যায় না তো।

—ওপরেও কি আকাশ দেখা যায়?

—তা নয়। তবে ঐ আর কি। কিছুটা ফাঁকা তো দেখা যায়।

সীমন্তক এসব ভাবপ্রবণতার মানে বোঝে না। পৃথিবীর ওপরে এক সময়ে জনবসতি ছিল এতো জানা কথা। কিন্তু মাটির নিচের জনবসতি তার চেয়ে এক বিন্দু খারাপ কি? সীমন্তক অবশ্য জন্মেছেই মাটির নিচে; তাই তার কাছে আকাশ বা ফাঁকা জায়গা দেখার কোনো আকর্ষণ নেই।

লিফট উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন চেক পোস্টে থামছে। পৃথিবীর ওপরে প্রতি মুহূর্তে পুরু হয়ে উঠছে বরফের আস্তরণ। তাই প্রতি মুহূর্তের খবর লিফটের যাত্রাপথে সংগ্রহ করে নিতে হয়। পৃথিবীর মাটির মাত্র একশ থেকে দেড়শ ফুট নিচে এখানকার জনবসতি। কিন্তু মাটির ওপর আরো দুশো তিনশো চারশো বা তারও বেশী ফুট বরফ জমে আছে। শূন্যের বহু বহু ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক—যা অ্যালকোহল ব্যারোমিটারেও মাপা সম্ভব নয়। মৃত, সাদা অবিরল তুষার ঝটিকায় আক্রান্ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তবু সংযোগ রাখতে হয় গর্ভনগরগুলোর। কারণ সংগ্রহ করতে হয় শ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বাতাস জল বিদ্যুৎ। বহুদূর মহাকাশে পৃথিবীর চারদিককার বিমর্ষ প্রায়ান্ধকার তুষারমন্ডলের বাইরে পরিক্রমারত রয়েছে মানুষের সৃষ্ট অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ—সেগুলোর সঙ্গেও অব্যাহত রাখতে হয় যোগাযোগ। তাই পৃথিবীর উপরিভাগে মানুষ বরফ ভেদ করে তৈরি করেছে বহু সংখ্যক বুদ্বুদ। নামে বুদ্বুদ দেখতেও তাই। এসকিমোদের ঘর ইগলু যেমন দেখতে ছিল অবিকল সেই রকম। তবে বরফ দিয়ে তৈরি নয়, এগুলো তৈরি হয়েছে মানুষের সৃষ্ট সবচেয়ে ঘাতসহ তাপসহ অসম্ভব শক্তিশালী পলিথিন দিয়ে। বুদ্বুদগুলো প্রতিদিনই বরফে ঢাকা পড়ে যায়, প্রতিদিনই সেগুলোকে ঠেলে আরো উঁচুতে তুলে দিতে হয় নিচে থেকে চাপ দিয়ে।

এইরকম একটি বুদ্বুদেই কাজ করতে হয় সীমন্তককে। প্রতিদিন সে বুদ্বুদে বসে মৃত তুষার যুগের সাদা পৃথিবীর দৃশ্য দেখে। প্রতিদিন তাকে মাটির ওপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে উপরিভাগের বরফের চাপের হিসেব নিতে হয়, ভূকম্পন তুষার স্তরের ঘর্ষণজনিত দুর্বিপাক ও আবহাওয়ার প্রতি মুহূর্তের গতিগতির দিকে নজর রাখতে হয়। কোনদিন যদি বরফের চাপে, গর্ভনগরের ছাদ ধসে যায় তবে মানুষের সর্বনাশ। তুষার যুগের শৈত্য সহ্য করা যে কোনো প্রাণীরই সাধ্যাতীত।

একটা দীর্ঘ শ্যাফটের ভিতর দিয়ে লিফট ধীরগতিতে উঠছে। সর্বশেষ চেক পোস্টে থামে সীমন্তক। দরজা খোলে। সামনে ছোট্টো একটা ইস্পাতের তৈরি ঘরে নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটি হাসিখুশী ছেলে বসে আছে। সে মাথা নেড়ে বলল—আমাদের বাবলটায় হয়তো কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। বড্ড বেশী বরফ পড়েছে দুদিন। আর বেশী ঠেলে তোলা যাবে না।

সীমন্তক ভ্রূ কুঁচকে ফিরে আসে। চেক পোস্ট থেকে ছেলেটি তাকে সবুজ বাতি দেখায়।

বুড়ো লোকটি এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। একটি টুলের ওপর চুপ করে বসে আছেন।

শেষ পর্যায়ে লিফট খুব ধীরে ধীরে চলে। এখানে শ্যাফট বা লিফটের সুড়ঙ্গ পর্যটি টেলিস্কোপিক। অর্থাৎ তা ইচ্ছে করলে জিরাফের মতো গলা লম্বা করতে পারে। তবে সে ক্ষমতাও সীমাবন্ধ। শেষ পর্যায়ে পুরোটাই গভীর কঠিন বরফের ভিতর দিয়ে যাওয়া। লিফটের ভিতরটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত। তবু গর্ভনগরের তুলনায় এখানে যেন একটু শীত বেশী, নীরবতা বেশী।

লিফট থামলে সীমন্তক দরজা খোলে।

বিশাল আয়তনের ঘরখানা সাদা আলোয় ভরে আছে।

গর্ভনগরের জীবনে সকাল বিকাল বা রাত্রি বলে কিছু নেই। সেখানে সব সময়ে কৃত্রিম আলোর জগৎ, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নেই, তারাভরা আকাশের দিকে তাকানোর উপায় নেই।

সাদা আলোয় ভরা বুদ্বুদের ভিতরে পা রেখেই নাক কুঁচকে যায় সীমন্তকের। প্রাকৃতিক আলো তার সহ্য হয় না। জন্মাবধি সে বড় হয়েছে কৃত্রিম আলোর মধ্যে।

আজ মেঘলা আকাশ ভেদ করে ক্ষীণ সূর্যরশ্মি দেখা দিয়েছে। চারদিককার লক্ষ কোটি বরফের স্ফটিকে সেই আলো চতুর্গুণ তেজে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাইরের দিকে চোখ রাখা দুষ্কর।

সীমন্তক কর্মরত আর একজন লোককে ছুটি দিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে বসে গেল। মহাকাশে অনেকগুলো মস্ত মস্ত উপগ্রহ আছে, যাদের বলা হয় স্বর্গনগর: কোনো কোনোটার দৈর্ঘ্য এক মাইল দেড় মাইল। পাশ বালিশের মতো চেহারার এইসব উপগ্রহের ব্যাসও কয়েক হাজার ফুটের মতো। কয়েক সহস্র লোক স্থায়িভাবে এগুলিতে বসবাস করছে। সেখানে কৃত্রিম উপায়ে চাষবাস, চিকিৎসা, মেরামতের কাজ সবই হয়। সন্তান জন্মায়, বড় হয়। সীমন্তকের কাজ এইসব কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। কাজ করতে করতে সীমন্তক বুড়ো লোকটির কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, বুদ্বুদের সুদূর একটি কোণে স্বচ্ছ দেয়ালে শরীর সিঁটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বাইরের দিকে নিথরভাবে চেয়ে আছেন।

মহাকাশ থেকে নতুন কোনো খবর নেই। শুধু জানা গেল ওপর থেকে তারা পৃথিবীর দিকে অবিরল নজর রেখে চলেছে। দক্ষিণ মেরুর দিকে গত কয়েকদিন তুষারপাত খুবই কম হয়েছে।

সীমন্তক খোশ-মেজাজে উঠে বুড়ো লোকটির কাছাকাছি এসে বলল—কী দেখছেন?

বৃদ্ধ তাঁর বলিরেখাবহুল মুখখানা ফিরিয়ে তাকালেন। কিন্তু সীমন্তককে যেন চিনতে পারলেন না। বিড়বিড় করে বললেন—সূর্য উঠেছে!

সীমন্তক হাসল। সূর্যের প্রতি তার নিজের কোনো দুর্বলতা নেই। বলল—মাঝে মাঝে ওঠে। কিন্তু ওদিকে অত চেয়ে থাকবেন না। চোখের ক্ষতি হতে পারে।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—চোখের ক্ষতি আর কী হবে। আমার পুরোনো চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে সেই কবে! এটা হচ্ছে চতুর্থ চোখ। আবার না হয় পাল্টাবো। একটু দেখতে দাও।

এরা কী দেখে, কী মজাই না পায় তা সীমন্তক ভেবেও পায় না। তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—দেখুন না। তবে দেখার তো কিছু নেই। শুধু সাদা বরফ।

লোকটা আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে বলল—সূর্য উঠেছে! বাইরে সূর্য উঠেছে। ওদের খবর দেবে না?

একটু ঝুঁকে সীমন্তক জিজ্ঞেস করে—কাকে খবর দেবো?

ঐ যারা নিচে রয়েছে! খবর দাও। তারপর চলো আমরা রোদ্দুরে যাই।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বুড়োটার মগজ বদলের সময় এসেছে। বাইরে গিয়ে স্বাভাবিক বাতাসের একটি শ্বাসও বুক ভরে নিলে সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস জমে পাথর হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের মধ্যে জমে কাঠ হয়ে যাবে শরীর। তাই বাইরে যাওয়ার দরকার হলে সম্পূর্ণ বায়ু-নিরোধক এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একরকমের পোশাক পরে যেতে হয়।

বুড়ো লোকটি উন্মুখ হয়ে সীমন্তকের দিকে চেয়ে বলল—আমি যখন খুব ছোটো তখন মাটির ওপর সবুজ গাছপালা দেখেছি। তারপর হিম হাওয়া আর তুষার আসতে লাগল। তখন পাতালে গর্ভ নগর তৈরির কাজ করতেন আমার বাবা। যখন আমরা নিচে চলে গেলাম তখন খুব কেঁদেছিলাম আমি। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—পৃথিবী আবার কয়েক বছরের মধ্যেই সবুজ হবে।

সীমন্তক এই বৃদ্ধের দুঃখকে সঠিক বোঝে না. তবু কিছু সমবেদনা বোধ করে সে বলে—পৃথিবী খুব শীগগীর সবুজ হবে না।

—কেন?

সীমন্তক ম্লান হেসে বলে—যত বরফ জমে আছে পৃথিবীর ওপর তা গলতে বহু বছর লেগে যাবে। তারপর বরফ গলে নেমে আসবে মহা প্লাবন। ওপরের

সমস্ত ভৌগোলিক সীমারেখা মুছে যাবে সেই প্লাবনে। জল সরতে লাগবে আরো বহু বহু বছর। সবুজ আসবে তারও বহু পরে।

—অরণ্য তৈরি হবে না, গাছে গাছে পাখি ডাকবে না, ফুলে ফুলে পতঙ্গের ওড়ার শব্দ শুনব না কেউ ততদিন? আমাদের সকালের সূর্যোদয়, বিকেলের বিষণ্ণতা, রাত্রির নিস্তব্ধতা বলে কিছু থাকবে না ততদিন?

বুড়ো মানুষরা শিশুর মতোই। সীমন্তক তাই ছেলে-ভুলানো স্বরে বলে—চিন্তা কি? আমাদের গর্ভনগরের পক্ষী নিবাসে যথেষ্ট পাখি রয়েছে, আমরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটির নিচে অরণ্য না হোক যথেষ্ট গাছপালা তৈরি করেছি, পতঙ্গেরও অভাব নেই আমাদের কীট প্রজনন ক্ষেত্রে।

বিষাদে ভরে গেল বৃদ্ধের চাউনি। মাথা নত করে বলল—তোমরা কেন লেজার রশ্মি এবং বিস্ফোরণের সাহায্যে সব বরফ গলিয়ে ফেলছো না?

—লাভ কি? শূন্যের বহু বহু নিচে নেমে গেছে তাপাঙ্ক। বরফ গলে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার তা জমাট বাঁধবে।

—কেন কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টি করছ না?

সীমন্তক বৃদ্ধের পিঠে হাত রেখে বলে—আমরা সে চেষ্টাও করছি। কিন্তু কৃত্রিম সূর্যেরও সাধ্য নেই পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপ ফিরিয়ে আনার।

বৃদ্ধ কথা বললেন না। বাইরের স্তিমিত সূর্যরশ্মির দিকে চেয়ে রইলেন। খোড়ো হাওয়ার গুঁড়ো বরফ বালির মতো উড়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বরফের স্তম্ভ, খিলান, গম্বুজ, আবার আপনা থেকেই ভেঙে যাচ্ছে সব।

বেতার যন্ত্রে মহাকাশের বার্তা আসছে। সীমন্তক তার টেবিলে ফিরে গেল এবং বৃদ্ধের কথা তার আর মনে রইল না। বার্তা আসছে, মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে দক্ষিণ মেরুতে একটি জায়গায় সামান্য কিছু বরফ গলে ছোট্ট একটু জলাশয় তৈরি হয়েছে। খবরটা অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য। তবু সীমন্তক গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞদের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিল। দীর্ঘ টানেলে যুক্ত পৃথিবীর গর্ভনগরের বিশেষজ্ঞরা কয়েক মিনিটেই দক্ষিণ মেরুতে পেঁাছোতে পারবেন।

যখন সীমন্তক তার অত্যন্ত জরুরী বার্তাটি যথাস্থানে পেঁাছে দিতে ব্যস্ত তখন সেই বৃদ্ধ মানুষটি প্রাণপণে নিজেকে স্বচ্ছ কঠিন দেয়ালে চেপে ধরে নিবিড় নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টির বিভ্রম ঘটল।

তিনি দেখতে পেলেন অফুরান তুষার-স্তূপের একঘেয়ে সাদা রঙের ভিতর থেকে হঠাৎ ছোট্ট রামধনু রঙা গিরগিটির মতো একটি প্রাণী বরফের স্তর ভেদ করে মাথা তুলল। কী একটু দেখল চারদিকে বিঘৎ খানেকের বেশী বড় নয়। তারপরই আবার টুক করে সরে গেল গর্তের মধ্যে। অবিশ্বাস্য! সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য! নিশ্চয়ই চোখের ভুল! বুড়ো লোকটি বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—রোদ্দুর! গিরগিটি! রোদ্দুর! গিরগিটি! তবে কি অরণ্যও জেগেছে? সবুজ? পাখি?

বৃদ্ধ লোকটি চারদিকে চেয়ে দেখেন বন্ধুদের ভিতরে কর্মব্যস্ত কয়েকজন মানুষ তাদের যন্ত্রপাতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কেউ তাঁকে দেখছে না।

বৃদ্ধ চুপিসারে বন্ধুদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সুড়ঙ্গের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। একদম শক্ত করে আঁটা ভারী এই ধাতব দরজা। কিন্তু বৃদ্ধ দরজা খোলার কৌশল জানেন। মাথার ওপরকার একটি হুইল ঘুরিয়ে তিনি দরজা ফাঁক করলেন এবং টুক করে নেমে পড়লেন সুড়ঙ্গে। পথ অল্পই। পথের শেষে আর একটি ঢাকনি। সুড়ঙ্গের মধ্যে গরম হাওয়া বওয়ানো হচ্ছে তবু এখানে দুর্দান্ত শীতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধ শীতকে গ্রাহ্য করেন না। বিড়বিড় করে বলতে থাকেন —ওরা জানে না বাইরে রোদ উঠেছে। বরফ গলছে। গিরগিটি দেখা দিয়েছে। ওরা জানে না বরফের নিচে ঘাস জন্মেছে···বলতে বলতে তিনি বাইরের দরজা খুলে এক লাফে বেরিয়ে এলেন বাইরের সাদা মৃত হৈম পৃথিবীতে।

একবারের বেশী শ্বাস টানতে হল না তাঁকে। পরমুহূর্তেই জমে কাঠ হয়ে পড়ে গেল তার শরীর।

ব্যাপারটা টের পেতে সীমন্তকের দেরি হয় নি। টি ভি প্যানেলেই সে দৃশ্যটা দেখেছে। বাইরে যাওয়ার পোশাকটুকু পরে নিতেই যেটুকু সময় নিয়েছে, পর-মুহূর্তেই সে বাইরে এসে বৃদ্ধের কাঠের মতো শক্ত শরীরটা বয়ে আনল ভিতরে। শরীরে প্রাণের চিহ্ন নেই।

একটা কাচের বাক্সে বৃদ্ধের শরীরটা শুইয়ে দিল সে। সুইচ টিপল। বৃদ্ধকে বাঁচিয়ে তোলাটা তেমন কঠিন হবে না। এই বাক্সের মধ্যে ক্রমশ এক হীটার শরীর-টাকে গরম করে তুলবে, বুক মালিশ করবে, শ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখবে। বাকি কাজটুকু করবেন গর্ভনগরের মহান চিকিৎসকবৃন্দ। সীমন্তক অবাক হয়ে দেখল। বৃদ্ধের মৃত মুখে একটু নির্মল আনন্দের হাসিও তার শরীরের মতোই জমে বরফ হয়ে আছে।

সীমন্তক কাঁচের বাক্সে শোয়ানো বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তার পর আপন মনেই বলল—কেন বুড়োবাবা তোমরা একটু রোদ্দুর দেখে অমন পাগল পারা হয়ে ওঠো?

বৃদ্ধের শরীর আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে, প্রাণের চিহ্ন ফিরে আসছে। সীমন্তক জানে বুড়ো লোকটি বেঁচে উঠবে। তবে হয়তো এবার সত্যিই বুড়োর মগজ বদলে ফেলবেন ডাক্তাররা! কিছু কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বদলাতে হবে।

সীমন্তক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল—বেঁচে উঠবে বটে বুড়োবাবা, তবে হয়তো আর কোনোদিন রোদ্দুর দেখে আনন্দে হেসে উঠবে না।

কিন্তু যতক্ষণ না মগজ বদল হচ্ছে, যতক্ষণ না মৃত্যুর ছায়া সরে যাচ্ছে শরীর থেকে ততক্ষণ বৃদ্ধ এক অমলিন রোদ্দুর গিরগিটি, অরণ্য ও সবুজের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থেকে হাসতে থাকেন।

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সীটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে, ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সীটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখিই প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস,কণ্ডাকটর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরো সরত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, জামা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশ হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায় নি তো। এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে,বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কণ্ডাকটারকে দু কথা শুনিয়েছেন, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গরু ছাগল পেয়েছো, নাকি তামাকের বস্তা? এখন

অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরো ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনো সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকীডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হতুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবার সুনসান হয়ে,যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়? জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন-নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরোনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের। এই যে সে ভালমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেক খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য 'আহা. উহুঃ' করার আছে কে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই এখন ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি পরা একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটা খুন হওয়ায় আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম।

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয়ই তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার চ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভাল করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

কাঁকালে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু জোড়া চোখ থাকলে ভাল হত। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনো দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরী। গায়ে সেই একপেশে বোতামঘরওলা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরো ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপকাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে কে একজন জানলায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে! তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কি যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনীমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কন্ডাকটর।

বাস থেমেছে। হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড় বড় চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পাটা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কি গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিও না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে

জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখ করে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়। কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছো নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে।

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না; মুখ দেখে যায়। বেশীর ভাগ পা-ই প্যাণ্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁক ফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরো কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি যে বসেছো কচুর ওপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কি যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে। এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা, দেখার জন্য একেবারে আঁকুবাঁকু যে। দু দুটো বউ পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কি যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে, আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না!

কচুওয়ালা সব শুনছে। ভারী লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো। জুঁই বলে।

জ্বলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কি করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না কেউই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কণ্ডাকটর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে তা জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশী লোক নামে। এমন কি কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভাল চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো!

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি।

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে। উদ্ধার করেছো। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটুলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায়ে হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কি হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনো দেখছে। বিরক্তি কেটে এবার একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময়ে তো খগেনবাবুরই বিয়ে করা বউ ছিল জুঁই।